মোগল মুরাক্কা চিত্রণ : বিকাশ ও শৈলী

গবেষক

মোঃ আশরাফুল কবীর
রেজিস্ট্রেশন নং- ১৫, সেশন- ২০১১-২০১২
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. নাজমা বেগম
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'মোগল মুরাক্কা চিত্রণ : বিকাশ ও শৈলী' শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রণীত । আমার জানামতে পূর্বে এই শিরোনামে কেউ গবেষণা করেননি । অভিসন্দর্ভটি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি অথবা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশ করা হয়নি ।

মোঃ আশরাফুল কবীর
এম. ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং - ১৫
সেশন - ২০১১-২০১২
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, মোঃ আশরাফুল কবীর, রেজিস্ট্রেশন নং ১৫-২০১১/২০১২, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল গবেষক হিসাবে আমার তত্ত্বাবধানে 'মোগল মুরাক্কা চিত্রণ : বিকাশ ও শৈলী' শীর্ষক একটি অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করেছেন । গবেষণাটি মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচিত । আমি সম্পূর্ণ পান্ডুলিপিটি পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

ড. নাজমা বেগম
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অঙ্গীকারপত্র		i
প্রত্যয়নপত্র		ii
সূচিপত্র		iii
মুখবন্ধ		iv
চিত্রের তালিকা		ix
মোগল মানচিত্র		xii
মোগল পতাকা		xiii
মোগল বংশানুক্রমিক তালিকা		xiv
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	১-১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	মুরাক্কার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	১৩-২৯
তৃতীয় অধ্যায়	মুরাক্কার ভারতীয় সূত্রপাত	৩০-৪৩
চতুর্থ অধ্যায়	মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়কালের মুরাক্কা	৪৪-৭১
পঞ্চম অধ্যায়	বাদশাহ শাহজাহানের সময়কালের মুরাক্কা	৭২-৮৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	মোগল পরবর্তী মুরাক্কা	৮৬-১০২
সপ্তম অধ্যায়	উপসংহার	১০৩-১০৫
পরিশিষ্ট- ১	মুরাক্কার গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিত্র	১০৬-১১৪
পরিশিষ্ট- ২	চিত্রকলার পরিভাষা	১১৫-১১৬
গ্রন্থপঞ্জি		১১৭-১২৮

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত দেশ। এশিয়া মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ও প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ এই এলাকাটির রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা। প্রাচীন কাল হতে বহু জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মিলন ক্ষেত্র ভারতবর্ষ। ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় দ্রাবিড়গণই ছিলেন এর সর্বপ্রাচীন অধিবাসী। কালক্রমে আর্য, শক, কুষান ও হুনগন এখানে বসতি স্থাপন করেন। প্রতিটি জাতি বা গোষ্ঠি নিজস্ব শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, স্বকীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তাদের সময়কাল অতিবাহিত করে। কালের অমোঘ নিয়মে এক জনগোষ্ঠি হতে অন্য জনগোষ্ঠির সময়কাল পেরিয়ে যাওয়ার সাথে-সাথে পূর্ববর্তীদের রীতি-রেওয়াজ, ঐতিহ্য, জ্ঞান, আবিষ্কার পরবর্তীদের করেছে সমৃদ্ধ। এই জনপদে প্রায় দুই হাজার উপভাষা (dialect) প্রচলিত আছে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, শিখ, অগ্নি উপাসক প্রভৃতি ধর্মের মানুষের সংমিশ্রণে এর জনসমাজ।

ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে মিয়ানমার ও পশ্চিমে পারস্য ও আরব সাগর। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম সভ্যতা মেসোপটেমিয় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ভারতবর্ষের অদূরে অবস্থিত। এছাড়া চৈনিক সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, অজান্তা-ইলোরা সহ অসংখ্য বৈদেশিক ও আঞ্চলিক সভ্যতা এই অঞ্চলকে করেছে সমৃদ্ধ। সাধারণভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা তিনটি স্তরে বিভাজন করতে পারি। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের পূর্ববর্তী সময়কাল যা হিন্দু ও বৌদ্ধদের শাসনামল বলে পরিচিত তা প্রাচীন যুগ, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে সালতানাত ও মোগল শাসনকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল মধ্যযুগ এবং বৃটিশ শাসনের সময়কাল হতে আধুনিক যুগ। তবে এই যুগ বিভাজন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য সম্পর্কিত গবেষণা আজও চলছে।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকারের দূর্বলতা ও অক্ষমতার সুযোগে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য স্বাধীনভাবে তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করত। তবে কাশ্মীর, মালব, কনৌজ, আসাম, গুজরাট, বুন্দেলখন্ড, দিল্লী, সিন্ধু ও বঙ্গদেশ ছিল বিদ্যমান রাজ্যগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুসংহত এবং সমৃদ্ধ। শিক্ষায় তদানিন্তন পশ্চিম ভারতের বল্লভী ও বিহারে প্রতিষ্ঠিত 'নালন্দা' উন্নত শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিখ্যাত ছিল। এসকল জায়গায় জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। গান্ধারা, সাঁচি, খাজুরা, অজন্তা-ইলোরা চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যকর্মের শ্রেষ্ঠ নির্দশন হিসেবে আজও পৃথিবীতে টিকে আছে।

মুসলিম অভিযানের প্রথম পর্যায়টি স্থায়ী কোন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছাড়াই শেষ হয়। গজনীর শাসক সুলতান মাহমুদের মাধ্যমে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়। যদিও তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সম্পদ নিয়ে গজনীকে সমৃদ্ধ করা । তদুপরি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্থানীয়দের মধ্যে পরিবর্তনের আভাস স্পষ্ট হতে থাকে। এই সময় মহাকবি ফেরদৌসির হাতে পারস্যের অমর বীরত্বগাথা নিয়ে 'শাহানামা' মহাকাব্য রচিত হয়। ফেরদৌসির এই অমূল্য সাহিত্য মুসলিম চিত্রকলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। পারস্য হতে মোগল সকল শাসকগণই এই মহাকাব্যের চিত্রনে ভূমিকা রাখেন। একই সময় মনীষী আবু রায়হান আল বেরুনী খাওয়ারিজম থেকে সুলতানের দরবারে আসেন। তাঁর রচিত গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু চিত্রকলাকে আলোকিত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ঘোর অধিপতি সাহাব উদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দিল্লী বিজয়ের সূত্র ধরে ভারতে প্রকৃত মুসলিম শাসনের সূত্রপাত। ভারতবর্ষের এই শাসনে মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক । তবে এখানে মুসলিম শাসকদের একটি অভিনবত্ব রয়েছে । তারা বিজিত দেশে স্থানীয় সমাজ সংস্কৃতিকে দ্রুত আত্নস্থ করে একটি নতুন মিশ্রিত ধারাকে এগিয়ে নিয়েছে । দিল্লীর সুলতানি আমলে মামলুক অথবা খলজিদের চিত্রকলার প্রতি কতটা দূর্বলতা ছিল তার কোন বিস্তর প্রমানাদী নেই । আর তুঘলক আমলের পবিত্র কোরআনকে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে সজ্জিত করণের উদাহরণ রয়েছে । পবিত্র কোরআনের সেই কপিটি (১৩৯৯ খ্রি:) বর্তমানে জেনেভায় প্রিন্স সদর উদ্দিন আগা খানের সংগ্রহে আছে । তবে ব্যাপক অর্থে সুলতানি আমলে চিত্রকলার বিকাশে দুইটি অন্তরায় ছিল বলে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমানাদি রয়েছে । তা হোল- সেই সময়কার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং তৈমুর লং কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ ও রাজধানীর ধ্বংস সাধন । এই ক্ষেত্রে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের (১২৫৮ খ্রি:) সাথে এর চরিত্রগত মিল রয়েছে । কেননা, উল্লেখিত দুইটি ধ্বংস যজ্ঞই বাগদাদ ও দিল্লীর ঐতিহ্যগত শিল্পকর্ম গুলোকে বিনষ্ট করে দেয় । এত কিছুর পরও সালতানাত আমলের আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক পর্যায়ে চিত্রকলা চর্চায় যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্যণীয় । এই সময় মালওয়া, জৌনপুর, বাঙলা, দাক্ষিণাত্য, আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে যে শিল্প সংস্কৃতির চর্চা হতো তার পরিধি অনেকটা মোগল আমলের কর্মকান্ডকেও স্পর্শ করেছে।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা হয় জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবুরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি:) হাত ধরে । বাবুরের উত্তরসূরি হুমায়ূন ১৫৪৬ খ্রি: রাজত্ব হারিয়ে এক বছর তাব্রিজের সাফাবিদ দরবারে আশ্রয় নেন । এই সময় তিনি তৈমুরীয় চিত্রকলার শিল্পী যুগের বিস্ময় কামাল উদ্দিন বিহযাদ এর

সমসাময়িক চিত্র শিল্পী মীর সায়িদ আলী ও খাজা আবদুস সামাদের সাথে পরিচিত হন । ১৫৫০ খ্রি: কাবুলে নির্বাসন অবস্থায় 'দাস্তানে আমীর হামজায়' মীর সায়িদ আলী ও তাঁর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় শিল্পীরা কাজ করেন । হুমায়ূনের মৃত্যুর পর আকবরের সময়ে ঐ শিল্পীদের মাধ্যমে সাফাবিদ রীতিতে চিত্র আঁকা হোলেও ক্রমান্বয়ে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবেশ করতে থাকে ও স্বাতন্ত্র্যভাবে মোগল চিত্ররীতির সূচনা করে । পরবর্তিতে আকবর ও জাহাঙ্গীর ঈরাণী কলমের শিল্পীদের সমন্বয়ে যে পথ পরিক্রমা তৈরী করেন তা ভারতের চিত্র ইতিহাসকে বদলে দেয় । রাজ্য পরিচালনার স্বার্থে বাদশাহ ও অমাত্যবর্গদের প্রতিকৃতিকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে কিছু *'মুরাক্কা'* তৈরী করা হয় । আকবরের চিত্রশালাতে ঈরাণী রীতিতে জন্ম নেয়া এই পদ্ধতি জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরাঙ্গজেব ও দারাশিকোহ এবং পরবর্তী মোগল শাসকদের সময়কাল পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ঘটে । রাজন্যবর্গের অনুগ্রহে গড়ে ওঠা *'মুরাক্কা'* বা চিত্র সংগ্রহের এই পদ্ধতি সমসাময়িক বিশ্বে চিত্র প্রেমিক ও গবেষকদের গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে ।

ছাত্রাবস্থায় কেন জানি পাঠ্যসূচির সকল পত্রগুলোকে কমবেশী পছন্দ করলেও চিত্রকলা-স্থাপত্যের প্রতি ভালবাসা ছিল প্রগাঢ় । হয়ত এর জন্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষা গুরু মোঃ শামসুল হক, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. এম আর তরফদার, প্রফেসর ড. হাবিবা খাতুন, প্রফেসর ড. পারভীন হাসান ও প্রফেসর ড. আয়শা বেগম যে পুত্রস্নেহে পাঠদান করতেন তার কৃতিত্ব তাঁদেরই। পরিশেষে মোগল চিত্রকলার সম্ভাবনাময় অনেক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে ঐতিহ্যগত মোগল '*মুরাক্কা*' সম্পর্কে নতুন কোন অজানা ঐতিহাসিক সূত্র যুক্ত করার অভিপ্রায়ে আমার যে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা- এটা তারই অংশ ।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব মো. হাবিবুর রহমান শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও পরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন হতে একজন সৎ, কর্মঠ এবং নীতিবান কর্মকর্তা হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন । গবেষণা কর্মটি ছাপার অক্ষরে বের হোচ্ছে, এ সময় বিষাদে বুকটা ভারী হয়ে আছে। তিনি আল্লাহর মেহমান হয়েছেন ২০১৬ সালের ০১ ডিসেম্বর । মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা তাঁকে রাসুল (সা.) এর সুপারিশ সহ জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন (রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা)। তবে গর্ববোধ করি, যখন আব্বার প্রতি সম্মানের কিয়দাংশ আমরা পাই।

আর আমাদের মা, মোছা. রওশন আরা- অসম্ভব ধৈর্য্য, মমত্ববোধ এবং দায়িত্ব নিয়ে এখনও সবাইকে আগলিয়ে আছেন । জীবনে স্বপ্ন দেখতে তিনিও আমাদের শিখিয়েছেন । কঠোর অনুশাসন ও গভীর ভালবাসা দিয়ে সন্তানদের ভালো মানুষ হওয়ার সাথে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করানোর যত ব্যবস্থা- সবই

তাঁর চিন্তার ফসল। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও বরকতময় উপস্থিতি আমাদের পরিবারের জন্য আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আল্লাহর নিকট তাঁর শারীরিক সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠি জীবন সঙ্গী সোহেলী পারভীন দেড় যুগের অধিক সময় ধরে সুখ-দুঃখের অংশিদার । সত্যবাদিতা, সৎ চিন্তা, কর্মঠ, সদালাপি ও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন একজন মানুষ । আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম ও উত্তরাধীকার হাফসা কবীর অর্পা ও আশরা কবীর তুপা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেওয়া শ্রেষ্ঠ আমানত । তাদের প্রতিও ভালবাসা জ্ঞাপন করছি ।

আমার জীবনের যত অর্জন তার সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ । কোন দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে বিভাগের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত শিক্ষকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাহস পাইনি । আজ ক্ষুদ্র ছাপার অক্ষরে দুঃসাহসিক এই কাজটি করলাম । আশা করি আমার এই অক্ষমতাকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন । একই সাথে আমার শিক্ষা জীবনে অন্য সকল পর্যায়ের প্রয়াত ও জীবিত সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি রইল অসীম কৃতজ্ঞতা । সকলের নিকট আমার যে ঋন তা শোধ করার নয় । দয়া করে তাঁরা আমাকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তাতেই আমার জীবন ধন্য । আর জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রে যে অগ্রজ-শ্রদ্ধেয় সর্বদা আমার প্রেরনার ভিত্তিমূলে ছিলেন তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করছি।

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. নাজমা খান মজলিস ম্যাডামের প্রতি যিনি ইউরোপিয় ও মুসলিম চিত্রকলা এবং স্থাপত্যের সমসাময়িক কালের এই উপমহাদেশের কীর্তিমান গবেষকগণের অন্যতম ও তাঁর সকল কাজের গঠনমূলক সমালোচক জীবনসঙ্গী জনাব মুহাম্মদ মাসুম আলী খান মজলিস এর প্রতি । ছাত্রদের প্রতি কতটা মমত্ববোধ থাকতে পারে তা তাঁদের সাথে না মিশলে সেই স্নেহ হতে আজীবন বঞ্চিত থাকতাম। তাই তাঁদের সম্পর্কে যতটাই বলা হবে তা হবে অপ্রতুল । সময় অসময় নেই কত বিষয়ে তাঁদের বিরক্ত করেছি আজ ভাবতেই নিজেকে অপরাধী লাগছে । অনেক প্রতীক্ষিত গবেষণা কর্মটি মলাট বন্দি করতে পেরেছি তার সম্পূর্ন কৃতিত্ব তাঁদেরই ।

যাদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি তার মধ্যে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, প্রফেসর আতাউর রহমান বিশ্বাস, প্রফেসর ড. মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্যারকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । ড. মাসুদ রানা খান সর্বসময় পাশে থেকে সহযোগিতা করেছে । তার নিরন্তর প্রচষ্টা ছাড়া এই কাজ অসম্ভব ছিল । তার প্রতি দোয়া

ও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই । এ ছাড়া ড. খাদেমুল হক, ড. নাসির উদ্দিন গনি, ড. নাজলী চৌধুরী, ড. সাইফুল ইসলাম তাঁদের প্রতিও রইল কৃতজ্ঞতা ।

গবেষণা কাজটি সম্পাদনে আমাকে বেশ কিছু গ্রন্থাগার ও জাদুঘর ব্যবহার এবং পরিদর্শন করতে হয়েছে । এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ পাঠাগার, এম. আর. তরফদার স্মৃতি জাদুঘর, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো হতে যে সহযোগিতা পেয়েছি সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজী স্যারের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা ও সম্মাননা । সকল কিছুর উপর অগনিত শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি তৌফিক না দিলে আমার পক্ষে একটি অক্ষরও লেখা সম্ভব হোতনা । একই সাথে রাহমাতুল্লিল আলামিন নবী (সা.) এর প্রতি রইল অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

মোঃ আশরাফুল কবীর
এম.ফিল গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্রের তালিকা

১.১ **মোগল মানচিত্র**, ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাথিউ সিউটার কর্তৃক অংকিত, ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত

১.২ **মোগল পতাকা,** সৈজন্যে Ali Express.com, ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত

১.৩ **বংশানুক্রমিক তালিকা**, সৈজন্যে Pinterest, ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত

১.৪ **গুহাচিত্র আলতামিরা,** স্পেন, ৩৫৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব, ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত

১.৫ **আবদ আর রহমান আস সূফীর তারকা গ্রন্থের চিত্র,** বডলিন লাইব্রেরী, ১০০৯ খ্রি:

১.৬ **The Four Knight of Kai Khosru in Mountain,** শাহনামা, আগা খান সংগ্রহ,১৩৪১ খ্রি:

১.৭ **পবিত্র আল-কোরআনের হাশিয়া সম্বলিত পাতা,** World Street Journal, ১৩৯০ খ্রি:

২.১ **প্রাসাদে স্নানরত ফ্রেসকো চিত্র**, জর্ডানের 'কুসাইর আমরা', Stock Photo, ৭১২-২৫ খ্রি:

২.২ **নৃত্যরত মহিলা ফ্রেসকো চিত্র,** জাওসাক আল খাকানী, Wikipedia, ৮৩৬ খ্রি:

২.৩ **কালিলা ওয়া দিমনা,** মেসোপটেমিয় চিত্রশালা, বিবলিউথিক মিউজিয়াম, প্যারিস, ১২৩৬-৪০ খ্রি:

২.৪ **ইস্কেন্দিয়ার ল্যাসোকে ধরাশায়ি করা,** শাহানামা, বৃটিশ মিউজিয়াম, প্যারিস, ১৩৩০-৫০ খ্রি:

২.৫ **রাজকুমার হমাই ও হমায়ুন,** হিরাত চিত্রশালা, খামসা, বৃটিশ মিউজিয়াম, ১৩৯৬-১৪৩০ খ্রি:

২.৬ **খসরু শিরিন মৃগয়া,** তাব্রিজ চিত্রশালা, ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্ট, ১৪৪০-৬০ খ্রি:

২.৭ **বৃদ্ধ বানর ও কাছিম,** কালিলা ওয়া দিমনা, বিবলিউথিক মিউজিয়াম, প্যারিস, ১৪৯০ খ্রি:

২.৮ **ইউসুফ জুলেখাকে প্রলুব্ধ করা,** বিহজাদ, বুস্তা, হিরাত, ইজিপশিয়ান লাইব্রেরী, কায়রো, ১৪৯২ খ্রি:

৩.১ **বুদ্ধের জন্ম,** পাল চিত্র, বাঙলাপিডিয়া**র সৈজন্যে,** খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতক

৩.২ **নিমতনামা,** সুলতান নাসির উদ্দিন শাহ, Wikipedia, ত্রায়োদশ শতক

৩.৩ **লৌরচন্দায়ন এর চিত্র,** The John Rylands Library, ১৩৭৭-৭৮ খ্রি:

৩.৪ **সাদির বুস্তান,** নাসির উদ্দিন, Alamy Collection, London, ১৫০৩ খ্রি:

৩.৫ **দরবেশের প্রতিকৃতি,** বিহযাদ, JPG & Wikimedia Commons, ১৫৪৫ খ্রি:

৩.৬ **নবী ইলিয়াস ডুবে যাওয়া শাহজাদাকে রক্ষা,** মীর সায়িদ আলি, বৃটিশ মিউজিয়াম, ১৫৭৭ খ্রি:

৩.৭ **হাতি,** ফতেহপুর সিক্রী দেয়ালের ফ্রেসকো, Alamy Stock Photo, London, ১৫৬৮ খ্রি:

৩.৮ **রাজপুত দরবার হল,** Rajosthan Office Library, India, ১৭ শতকের শেষ

৩.৯ **তুতিনামা,** পারস্য চিত্রকলা, ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম, ১৫৬০ খ্রি:

৩.১০. **খাদ্য গ্রহণ,** বাবুর থেকে জাহাঙ্গীর, Indian Express, ১৬১৫ খ্রি:

৩.১১ **বাগান (চারবাগ),** বাবুরের পরিকল্পনা, আগা খান, ১৬৩৫ খ্রি:

৪.১ **জাফরনামা,** তৈমুরের সিংহাসনে বসা, John Hopkins University, ১৬২০ খ্রি:

৪.২ **শেখ সদির প্রতিকৃতি,** আবুল হাসান, Walters Art Museum, ১৬১৫ খ্রি:

৪.৩ **টার্কি মোরগ,** মনসুর, Victoria and Albart Museum, ১৬১২ খ্রি:

৪.৪ **জাহাঙ্গীরের সিংহ শিকার,** মনোহর, Rampur State Library, ১৬১০ খ্রি:

৪.৫ **পাখি,** মনসুর, ভীভার সংগ্রহ, ১৬৩০ খ্রি:

৪.৬ **শাহজাদা খুররমকে ওজন করা,** বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন, ১৬১৫ খ্রি:

৪.৭ **ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব,** জাহাঙ্গীর, বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন, সপ্তদশ শতকের প্রথমাংশ

৪.৮ **সেন্ট অ্যান্টনি অ্যাবট,** নাদিরা বানু, গোলেস্তা গ্রন্থাগার, তেহরান, ১৬০০-১৬০১ খ্রি:

৪.৯ **পারসিক যুবক,** রোকেয়া বানু, গোলেস্তা গ্রন্থাগার, তেহরান, ১৬০০-১৬০১ খ্রি:

৪.১০ **মর্টারডাম অফ সেন্ট সিসিলিয়া,** নিনি, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন, ১৬০০-০৫ খ্রি:

৪.১১ **রুশ রাজকন্যা,** জগন্নাথ, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন, ১৫৯৬ খ্রি:

৪.১২ **কবি ও যুবরাজ,** মুরাক্কা ই গুলশান, বিচিত্রন, গোলেস্তা গ্রন্থাগার, ১৬২০ খ্রি:

৪.১৩ **গ্লোব হাতে জাহাঙ্গীর,** মুরাদ জাদা, সদবি বিক্রয় সংগ্রহ, সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ

৪.১৪ **জাহাঙ্গীরের তীর ছোড়া,** আবুল হাসান, সদবি বিক্রয় সংগ্রহ, সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ

৪.১৫ **গোলশান-ই-তারিখ এর কভার পৃষ্ঠা,** গোলেস্তা গ্রন্থাগার, ১৬২৫ খ্রি:

৪.১৬ **ফররুখ শিয়ার**, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৭৩০ খ্রি:

৪.১৭ **বাহাদুর শাহ জাফর**, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লেটার মোগল, ১৮৫০ খ্রি:

৪.১৮ **শিকারনামা, আগা রিজা**, বষ্টন মিউজিয়াম, ১৬০৭-২০ খ্রি:

৫.১ **আকবর সিংহ ও গরুর বাছুর,** গোবর্ধন, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬৪০ খ্রি:

৫.২ **চারজন বিখ্যাত ব্যক্তি,** দৌলত ও বালাচান্দ, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬৩৫ খ্রি:

৫.৩ **অশ্বারোহী শাহজাহান,** পায়াগ, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬৫০ খ্রি:

৫.৪ **শকুন,** মনসুর, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬২৬ খ্রি:

৫.৫ **ক্যালিগ্রাফির পাতা,** মীর আলী হারভী, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬৩০ খ্রি:

৫.৬ **শোভাবর্ধন ফিতা,** কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬৪৫ খ্রি:

৫.৭ **দিলপছন্দ,** মনোহর, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৬৪২ খ্রি:

৫.৮ **বন্য হাস,** মুহাম্মদ খান, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৬৩৫ খ্রি:

৫.৯ **পারশিক যুবক,** মুহাম্মদ খান, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৬৪০ খ্রি:

৫.১০ **দারাশিকোহ শিক্ষকের সাথে,** চিতরমন, বৃটিশ লাইব্রেরি, ১৬৩০ খ্রি:

৫.১১ **নাদিরা বানু,** ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৬৪৫ খ্রি:

৬.১ **গেনটিলের একটি চিত্র,** বৃটিশ মিউজিয়াম, ১৭৯০ খ্রি:

৬.২ **শাহ আলম দ্বিতীয়,** Wikipedia, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৮৪০ খ্রি:

৬.৩ **Peacock Throne**, Wikipedia, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ১৮৫০ খ্রি:

৬.৪ **বাহাদুর শাহ জাফর,** ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, Wikipedia, ১৮৫০ খ্রি:

৬.৫ **ফ্রেজার এ্যালবাম,** গোলাম আলী খান, বৃটিশ মিউজিয়াম, Pinterest, ১৮৪০ খ্রি:

৬.৬ **উইলিয়াম ফুলারটনের প্রতিকৃতি,** দিপ চাঁদ, মুর্শিদাবাদ যাদুঘর, ১৭৬০ খ্রি:

৬.৭ **মুহাম্মদ খান বঙ্গাস,** লেটার মোগল, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৭১০ খ্রি:

মোগল মানচিত্র

চিত্র নং- ১.১ ‘Imperii Magni Mogolis’ শিরোনামে ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মেথিউ সিউটার (Matthew Seuter) কতৃক খোদাইকৃত মোগল মানচিত্র্

মোগল পতাকা

চিত্র নং- ১.২ মোগল সাম্রাজ্যের প্রতীক পতাকা

মোগল বংশ তালিকা

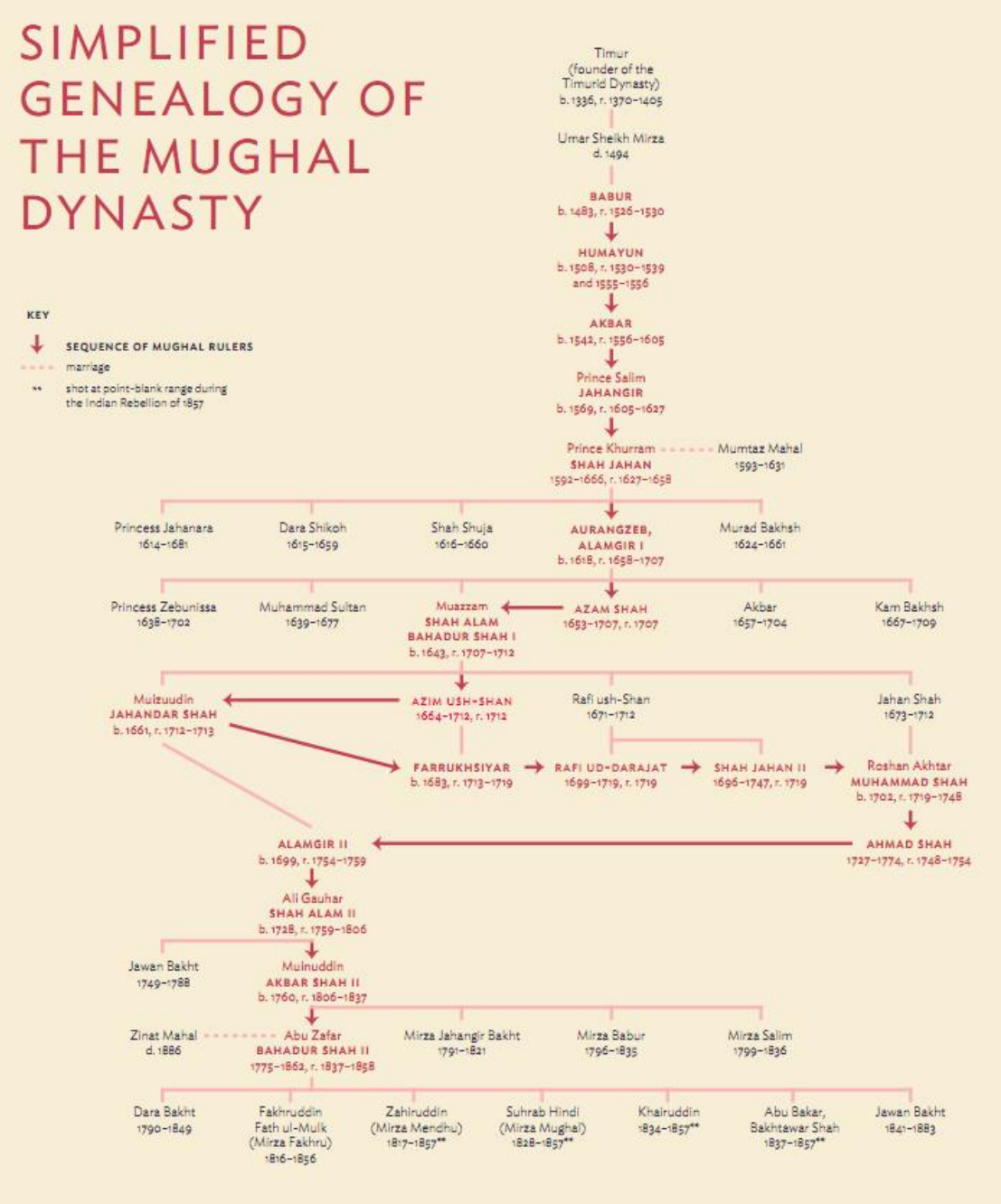

চিত্র নং- ১.৩ মোগল বংশ তালিকা, সৈজন্যে Stock Photo

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে চিত্রকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে চিত্রকলার আবির্ভাব ঘটে। সভ্যতার সূচনা লগ্ন হতে এর চর্চা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আসেনি। জীবন সংগ্রামে প্রতিকূল পরিবেশে হিংস্র পশু-পাখির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার মন্ত্র হিসেবে চিত্রকলার সূত্রপাত হয়। কালক্রমে সকল প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে চিত্রকলা মানুষের বিশ্বাসের স্থানটি দখল করে নেয় । প্রায় দশ লক্ষ বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানবের উদ্ভব হয়েছিল বলে ধরণা করা হয়। তখন পৃথিবী ছিল হিংস্র শ্বাপদে ভরপুর। মানুষকে টিকে থাকতে হয়েছে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষ প্রকৃতি ও হিংস্র পশু থেকে বাঁচার কৌশলে আবিস্কার করেছে অস্ত্র। আর তারা আশ্রয় নিয়েছে গুহায়। প্রাচীন যুগের এই গুহা নিবাসীগণই সর্বপ্রথম তাদের বাসগুহায় চিত্রের সূচনা করেন। ‘এই সময় মানুষ বাস্তবতা ও তাঁর আঁকা চিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়নি। তাঁর কাছে অংকিত বস্তুটিই ছিল বাস্তব। এই সময়ের গুহাচিত্রের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হচ্ছে স্পেনের আলতামিরা (ছবি নং ১.৪) এবং ফ্রান্সের লাসকো (Lascaux) ও আইজিস (Eyzies)’।[১] ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর স্পেনে মারসেনিনো দা সাঁওতাল সর্বপ্রথম এই গুহাচিত্রের আবিস্কারক। সুতরাং গুহাচিত্রের আবিস্কারের মাধ্যমে প্রতিয়মান হয় যে, চিত্রকলা মানব সভ্যতার প্রারম্ভ হতেই মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ইতিহাসের প্রামাণ্য উপকরণ।

১.৪ গুহাচিত্র আলতামিরা, স্পেন, ৩৫৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব

হাজার বছরের এই ধারার উত্তরসূরি মুসলিম চিত্রকলা। সাসানীয়, ম্যানিকিয়ান, বাইজানটাইন, চীনা, কপ্‌টিক ও ভারতীয় কলাকৌশল এর উৎসমূল এবং বিস্তারনে ভূমিকা রেখেছে। প্রারম্ভে চিত্রকলা সম্পর্কে মুসলিমদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বিশেষভাবে কার্য্যকরি ছিল। প্রশ্ন উঠেছিল এর বৈধতা নিয়ে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে আলেম-উলামাগণ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। মহানবী (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এর সময় এই শিল্পের তেমন প্রসার না ঘটলেও উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনের সময়কালে ক্রমান্বয়ে এর জাগতিক প্রসার ঘটতে শুরু করে। ‘হিন্দুধর্ম,

বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মের অনুরূপ ইসলাম শিল্পকলাকে ধর্মের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেনি। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি অথবা ধর্ম প্রচার ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় ভাবধারার পরিপন্থী। কারণ ইসলামে মূর্তিকলার স্থান নেই। ধর্মীয় প্রেরণা ব্যতিরেকে মুসলিম শিল্পী সৃজনশীল দক্ষতায় স্বীয় শৈল্পীক অভিব্যক্তি, সুকুমার প্রবৃত্তি ও সহজাত শিল্পসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ করেছে অপূর্ব চিত্রকলায়'।[২] প্রসঙ্গত যেখানে খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মে শিল্পকলা বিশেষত ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে তাঁরা ধর্ম প্রসারের অনুসঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে, সেখানে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এর কোন স্থান নেই। ইসলাম সর্ব সময় একত্ববাদ ও নিরাকার সত্তায় বিশ্বাসী।

টি ডব্লিউ আরনল্ডের ভাষায়- 'চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের অনমনীয় এবং গোঁড়া মনোভাবের উৎপত্তি নিরুপণে ঐতিহাসিকগণ সমস্যার সম্মুখীন হন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নিকট প্রাচ্যের প্রচলিত হেলেনিক শিল্পকলার নৈসর্গবাদ এবং হুবহু সাদৃশ্যের প্রতিক্রিয়া এর অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কনের তীব্র বিরোধীতায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ইহুদীদের প্রভাবই আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত সমাধান বলে ধারণা করা হয়। মদীনায় রসুলুল্লাহ (সা.) এর হিযরতের সময় অসংখ্য ইহুদী বসবাস করত এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ইহুদী ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগের চিন্তাধারা এবং আচার-অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশে নব-দীক্ষিত ইহুদীদের প্রগাঢ় প্রভাব গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিগণিত হয়েছে .... রসুলুল্লাহ (সা.) এর অনেক হাদীসে ভালোমন্দ বর্ণিত নীতিমালা অনেক ক্ষেত্রে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং মনে করা হয় বাল্যকাল হতে নব-দীক্ষিত ইহুদীদের চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে যে বিরুপ ধারণা প্রদান করা হত তা-ই পরবর্তিকালে তাদের মাধ্যমে ইসলামে অনুপ্রবেশ করে'।[৩]

মুসলিম শিল্পীগণ এখানে তাঁর কর্মকান্ডকে পূঁজার উপকরণ হিসেবে না ভেবে বিষয়বস্তু অনুধাবন ও নান্দনিকতার দৃষ্টিতে চিত্রকলাকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পান। জাগতিক প্রয়োজনকে উপলক্ষ্য করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদ গ্রন্থরাজির বিষয়বস্তুকে অনুধাবনে ও সহজ উপস্থাপনের নিমিত্তে চিত্রাবলী সন্নিবেশিত হয়। ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যন্ত্র কৌশল প্রভৃতি গ্রন্থরাজি চিত্রায়ন হতে থাকে। শিল্পকলার এই মাধ্যমটি মুসলিমদের হাতে এক নতুন অগ্রযাত্রার সূচনা করে এবং প্রচলিত ধারার বাইরে একটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে।

মুসলিম চিত্রকলার উন্মেষ হয়েছিল মূলত দশম ও একাদশ শতাব্দীতে। এই সময় ফাতেমীয় শাসকগণ সহ আব্বাসীয় খলিফাগণ সর্বপ্রথম একনিষ্ঠভাবে শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আর পান্ডুলিপি চিত্রায়নের সর্বপ্রথম উদাহরণ হলো আবদ আর-রহমান আস-সুফীর 'কিতাব সূওয়ার আল-কাওয়াকিব আস-সাবিতার' (তারকা গ্রন্থ)। বডলিয়ান লাইব্রেরিতে রক্ষিত এই চিত্রয়ায়িত ছবি সমূহের সন ১০০৯

খ্রিষ্টাব্দে (ছবি নং ১.৫)।[৪] যদিও ঐতিহাসিক মাসউদীর তথ্য হতে জানা যায় যে, দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি পারস্য সম্বন্ধীয় একটি ইতিহাস গ্রন্থে পারসিক রাজাদের ছবি দর্শন করেছিলেন। এই গ্রন্থটি 'ইসতখারের' সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেখেছিলেন[৫] বলে মনে করেন। সে কারণে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন পাণ্ডুলিপির চিত্রায়ন এই অনুবাদের যুগেই অর্থাৎ নবম শতাব্দীর শেষার্ধে শুরু হয়েছিল।

১.৫ আবদ আর রহমান আস সূফীর তারকা গ্রন্থের চিত্র, বডলিন লাইব্রেরী, ১০০৯ খ্রি:

মুসলিম চিত্রকলার গোড়ার দিক হতে মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্রাকার চিত্রায়ন রীতি চলে আসছে। একটি পাণ্ডুলিপিকে কেন ক্ষুদ্রাকার চিত্র সম্বলিত বহু চিত্রে চিত্রায়িত করা হত তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কালীলা-ওয়া-দিমনা অনুবাদক 'ইবনে আল-মুকাফ্ফা' বলেছেন যে, যাতে পাঠকগণ বিশেষত তরুণ পাঠকবৃন্দ পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দ পায়। পাঠ্য বিষয়টি প্রথম হতে ক্রমান্বয়ে এর প্রয়োজনীয় অংশগুলো দৃষ্টিনন্দন ছবি ও নকসা সম্বলিত করে চিত্রায়ন করা হত। মূলত উমাইয়া শাসকগণ ছিলেন সম্প্রসারণবাদে বিশ্বাসী আর আব্বাসীয়গণ ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। সাম্রাজ্য বিস্তারের চাইতে মানব সভ্যতায় নিজেদের স্থান করে নেয়া ছিল তাদের প্রয়াস। ফলে আব্বাসীয়দের সময় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাইতুল-হিকমা'। যার একটি বিশেষ সেল ছিল অনুবাদ বিভাগ। গ্রিক ও প্রাচীন ভাষায় লিখিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী এখানে আরবিতে অনুবাদ করা হত। মনে রাখা প্রয়োজন আব্বাসীয়রা ধর্মীয় আন্দোলনকে সামনে এনেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করে পাণ্ডুলিপির চিত্রায়নের সময় না বলা গেলেও আব্বাসীয়দের শাসনামলের শেষ দিকে এই চর্চা শুরু হয়েছিল বলে অনুমেয়। চিত্রে শিল্পীদের স্বাক্ষর থাকলেও এগুলো প্রথমদিকে কোন খলিফার নির্দেশনায় হয়নি বরং হয়েছে প্রাদেশিক প্রশাসকদের দরবারে।

চিত্রিশিল্পে এই সময় হতে ইসলামি শিল্পকলায় একটি নতুন কৌশল লক্ষণীয়। কৌশলটি হল *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবাম। আরবী *'মুরাক্কা'* শব্দের শাব্দিক অর্থ ছবির সংকলন। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Collection of Miniature অর্থাৎ মিনিয়েচারের সংগ্রহ। আর পারিভাষিক ভাবে বলা- An Album, in book form containing Islamic Miniature Paintings and specimens of islamic calligraphy অর্থাৎ এমন একটি এ্যালবাম যা গ্রন্থ আকারে ইসলামি মিনিয়েচার চিত্র এবং ইসলামি হস্তলিখন এর নমুনা সংগৃহীত থাকে। সাধারণত *'মুরাক্কা'* গুলোর বাম পাতায় হস্তলিখন (Calligraphy) এবং ডান পাতায়

থাকত ক্ষুদ্রকার চিত্র (Miniature Painting)। সমসাময়িক বিশ্বে সংগ্রাহকদের নিকট এটি একটি জনপ্রিয় সংগ্রহ মাধ্যম। এতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজি, সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, যুবরাজ, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, চিত্রকর, প্রকৃতি, পশু-পাখি প্রভৃতি চিত্রের সংগ্রহ সংরক্ষিত থাকত। এ্যালবাম বা *'মুরাক্কা'*র প্রতিটি পাতা অত্যন্ত যত্নসহকারে বাঁধাই করা হত এবং বিভিন্ন মাপে এর পৃষ্ঠাগুলো তরল রঙ ও সোনার ফ্রেমবন্দি অবস্থায় চামড়া দ্বারা আবৃত থাকত।

১.৬ The Four Knight of Kai Khosru in Mountain, শাহনামা, আগা খান সংগ্রহ, ১৩৪১ খ্রি:

ইসলামি শিল্পকলায় *'মুরাক্কা'* যে একটি গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে তা সর্বপ্রথম জার্মান স্কলার হার্মান গোয়েটজ (D. Hermann Goetz) এর গুরুত্ব অনুধাবন করে পাঠক মহলে উপস্থাপন করেন (ছবি নং ১.৬)।[৬]

মোগল চিত্রকলা সম্পর্কে উপমহাদেশেও বিভিন্নভাবে গবেষণা হয়েছে এবং এর শাখা-প্রশাখা নিয়েও বিশ্লেষণ হয়েছে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত গবেষক ও শিল্প সমালোচক অশোক মিত্র ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারতের চিত্রকলা' শিরোনামে দুই খন্ডের দু'খানা অসাধারণ পুস্তক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। সেখানে আদি যুগ থেকে ভারতবর্ষের আধুনিককাল পর্যন্ত স্থানীয় ও মুসলিম চিত্রকলার রীতিনীতিগুলো মৌলিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অশোক মিত্র তাঁর পুস্তকের প্রথম খন্ডের ৫ম অধ্যায়ে 'মুঘল যুগ' শিরোনামে মুসলিম আমলের চিত্রকলা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেখানে মোগল চিত্রকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে তথ্য নির্ভর আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে লেখার ধারাবাহিকতায় *'মুরাক্কা'* এবং এর তাৎপর্য কোন কোন যায়গাতে উঠে এসেছে। তবে পারস্য চিত্রকলার উত্তরসুরী হিসেবে *'মুরাক্কা'*র স্বাতন্ত্র্যতা আলাদাভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

ভারতবর্ষের অন্য একজন চিত্র সমালোচক ও চিত্রশিল্পের বোদ্ধা রত্নাবলী চট্টোপধ্যায় ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে 'দরবারি শিল্পের স্বরপ : মুঘল চিত্রকলা' শিরোনামে থীমা প্রকাশনি, কলিকাতা হতে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তিনি 'মুঘল চিত্রকলার উপর পাশ্চাত্য প্রভাব' বিষয়ে গবেষণা করার সময় ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন চিত্রশালাতে যে সকল নিদর্শন সমূহ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেন, এটি তার একটি সারবস্তু। তিনি চিত্রকলার জাগতিক প্রয়োজনীয়তার সাথে সামাজিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার

প্রতি বেশী মনযোগি হয়েছেন। কার্যত মোগল চিত্রকলা একটি দরবারী চিত্রকলা। এটি ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে এবং ব্যয়বহুল। কেননা- মোগল সাম্রাজ্যের এই বিলাসিতাকে তিনি ভিন্ন চোখে দেখেছেন। তাঁর এই মনোভাব অধিকাংশ ভারতবর্ষের শিল্প সমালোচকদের মতেরই প্রতিফলন। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে- প্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতার এই অঞ্চলে মধ্যযুগে মুসলমানদের আগমন ও শাসনভার গ্রহণের সাথে সাথে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য সহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। যাই হোক- তাঁর আলোচনাতে দরবারি আভিজাত্যের এই মাধ্যমটিকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে মিনিয়েচার সংগ্রহের মাধ্যম বা *'মুরাক্কা'* নিয়ে আলাদা কোন বর্ণনা সংযোজিত হয়নি।

সমসাময়িক বিশ্বের জীবন্ত কিংবদন্তী শিল্প সমালোচক, গবেষক ও ঐতিহাসিক প্রফেসর আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন 'ইসলামী চিত্রকলা' নামে একটি পুস্তক রচনা করে মুসলমান শাসকদের এই কৃতিত্বের একটি সার্বজনীন বিশ্লেষণ তুলে এনেছেন। তাঁর আলোচনা আরব চিত্রকলা, পারসিক ও উসমানীয় চিত্রকলার মোড়কে মুসলিম চিত্রকলার বৈধতা, বিধি-নিষেধ, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এর বিস্তৃতি নিয়ে বিষদ ক্ষেত্রগুলোকে তুলে এনেছেন । তিনি *'মুরাক্কা'*র সূচনা থেকে মোগলদের চর্চা পর্যন্ত পৌঁছানোর একটি চিত্র যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন। পাঠ্য বই এর মলাটে বইটি একটি গবেষণা কর্মের উদ্দীপকের ভূমিকায় রয়েছে। যদিও তাঁর আলোচনা মোগল চিত্রকলার প্রতি অনাগ্রহকে বেশী প্রকাশ করে। কেননা তিনিও সাধারণ নাগরিকের সামাজিক অর্থনীতিকে দরবারী রাজসিকতার উপরেই স্থান দিয়েছেন। রাজকীয় ভোগ-বিলাস তৃণমূল অর্থনীতিকে আরো ক্ষতিগ্রস্থ করেছে বলে তাঁর ধারণাটিও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়ের মতামতেরই প্রতিফলন । বস্তুত সেই সময় হতে বিষয়টি গবেষণার উপাত্ত হিসেবে বিচ্ছিন্ন কিছু লেখালেখি হয়েছে। তবে পূর্ণ মাত্রার গবেষণা হয়নি বললেই চলে।

মুসলিম চিত্রকলায় *'মুরাক্কা'*র' সূচনালগ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মিনিয়েচারে 'হাশিয়া'র সর্বপ্রথম প্রচলন নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ইসলামি শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ত্রয়োদশ শতকে সর্বপ্রথম মিনিয়েচারে 'হাশিয়া'র (ছবি নং ১.৭-ক) প্রচলন

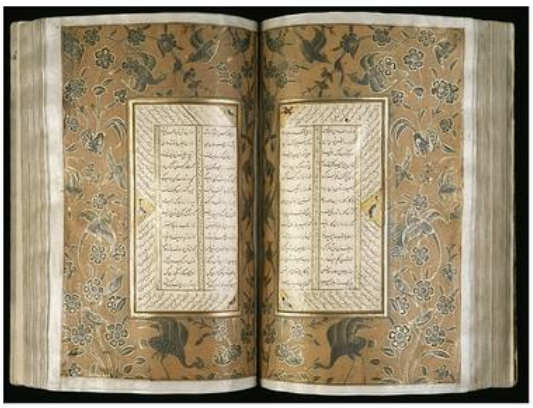

১.৭-ক পবিত্র আল-কোরআনের 'হাশিয়া' সম্বলিত পাতা, World Street Journal, ১৩৯০ খ্রি:

শুরু হয়।[৭] এই সময় ইলখানী যুগের চিত্রিত 'মানাফি-আল-হায়াওয়ান' (ছবি নং ১.৭-খ) এর মাধ্যমে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। উৎস হিসেবে পাই মুসলিম এবং অমুসলিম উভয় ঐতিহ্য। খ্রিষ্টিয় ও ম্যানিকিয়ান ধর্মীয় পুস্তকাদী অলংকরনের মাধ্যমে একটা ধারা এবং মুসলমানদের সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআনের পৃষ্ঠার পার্শ্বদেশে নক্সা সংযোজনের

ছবি নং ১.৭-খ, 'মানাফি-আল-হায়াওয়ান

মাধ্যমে এর অন্যধারার সূত্রপাত হয়। অমুসলিম ধারার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পিয়ারপন্ট মরগান লাইব্রেরিতে (Pierpont Morgan Library, New York) রাখা সেন্ট চার্চ এ্যাবির (St. Church Abbey) একটি ধর্মীয় পুঁথির মিনিয়েচারকে। এখানে মূল চিত্রকর্মটির চতুর্দিকের মার্জিনে জ্যামিতিক নক্সার ফাঁকে-ফাঁকে বিভিন্ন ধরণের পশুপাখি ও মানুষের প্রতিকৃতি অংকন করা হয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম চিত্রকলার অন্যতম উৎস ম্যানিকিয়ান শিল্পকলা। তাদের ধর্ম গ্রন্থের প্রান্তিক অংশ ফুল-লতাপাতা দ্বারা সুশোভিত করার উদাহরণ রয়েছে। একইভাবে সাফাভী ও মোগল আমলে জ্যামিতিক নক্সা ও অন্যান্য লতাগুল্ম দ্বারা চিত্রাবলীকে অধিক দৃষ্টিগ্রাহ্য করার যথেষ্ট চিত্রকর্ম রয়েছে। সুতরাং 'হাশিয়া'র প্রচলন উল্লেখিত দুই উৎস হতে প্রভাবিত তা সহযেই অনুমেয়।

খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকে এ ম্যানিকিয়ান ধর্মীয় পুস্তকগুলোতে মিনিয়েচারের প্রচলন হলেও একাদশ শতকে মার্জিন অলংকরণ লক্ষ্যণীয় হয় সর্বপ্রথম। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে পারস্যের পশ্চিম প্রান্তের আরবরা এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে এই 'হাশিয়া'র ব্যবহার পঞ্চদশ শতকে জালাইরী চিত্রকলায় অংকিত সুলতান আহমদ জালাইর-এর 'দিওয়ান' পান্ডুলিপিতে প্রতিয়মান হয়।[৮] ১৪১০-১১ খ্রিষ্টাব্দে ইস্কান্দার সুলতানের জন্য তৈরী 'শাহনামা' ও নিজামীর 'খামসা'য় মিনিয়েচারের প্রান্তিক অংশ বিভিন্ন ঘটনার ছোট ছোট রেখাচিত্র দ্বারা অলংকৃত হয়।[৯] সাফাভী আমলের শেষ দিকে মিনিয়েচারে 'হাশিয়া' আরও জমকালো হয়ে ওঠে। এই সময় পান্ডুলিপি ও *'মুরাক্কা'*র 'হাশিয়া'তে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে মানুষের প্রতিকৃতি ও ইউরোপিয় উপাদান পরিলক্ষিত হয়। আর ভারতবর্ষে মোগল চিত্রকলার প্রারম্ভ হতেই 'হাশিয়া'র প্রচলন শুরু হয় 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' এবং 'বাবুরনামা' চিত্রায়নের মিনিয়েচার

গুলোতে। প্রসংগত মিনিয়েচার ব্যতীত 'হাশিয়া'র উৎকৃষ্ট অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবামে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের ফরমায়েশে তৈরী এই *'মুরাক্কা'* গুলোতে বাস্তবঘেষা প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের মানুষের প্রতিকৃতি অংকন করা হয়। সুতরাং মিনিয়েচার বা 'ক্ষুদ্রাকার চিত্র' আর্কষণীয় ভাবে উপস্থাপনের নান্দনিক প্রয়াস 'হাশিয়া'কে আরও সমৃদ্ধ ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছে।

মোগল *'মুরাক্কা'*র উৎসমূল খুঁজতে গেলে আমরা সর্বপ্রথম সাফাভী রাজ দরবারের কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৫০৭ খ্রিষ্টাব্দে উজবেক সুলতান সায়বানি খান হিরাত দখল করেন, কিন্তু ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে সাফাভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাঈল সায়বানি খানকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই সময় যুগের বিস্ময় 'কামাল উদ্দিন বিহযাদ' নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী তাব্রিজে গমন করেন। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে সাফাভীদের সাথে অটোমান সুলতান সেলিমের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতায় শাহ ইসমাঈল ওস্তাদ 'কামাল উদ্দিন বিহযাদ' ও লিপিকার 'শাহ মাহমুদের' নিরাপত্তা নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং রাজধানী তাব্রিজ হতে কাযউইনে স্থানান্তরিত করেন। বস্তুত বিহযাদ ও তাঁর সহকর্মী ছাত্রদের শিল্পচর্চায় মুসলিম চিত্রকলা স্বর্ণ শিখরে উপনীত হয়। ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইসমাঈলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ তাহ্মাসপ সিংহাসনে বসেন এবং চিত্রকলায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে। এই সময় যেমন পাণ্ডুলিপির চিত্রায়ন হয়েছে তেমনি একক চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। পূর্ণ পাণ্ডুলিপির চিত্র উদাহরণ ছাড়াও শাহ তাহমাসপ এর আমলে চিত্র সম্বলিত বিচ্ছিন্ন কিছু পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ধরণের কর্মকান্ড চিত্রপ্রেমিকদের আকর্ষণের বিষয়বস্তু হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এর প্রথমটি আনুমানিক ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত এবং দ্বিতীয়টি ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে। যুদ্ধের এই ছবি দুইটিতে প্রথমটি 'মাহমুদ মুসাব্বির' ও দ্বিতীয়টি অন্য কারো আঁকা ছবি। পারস্য চিত্রকলার স্বর্ণযুগের এই সময়ে অর্থাৎ ১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মোগল বাদশাহ হুমায়ূন ভাগ্যান্বেষনে এক বৎসর তাব্রিজের সাফাবিদ দরবারে আশ্রয় নেন। যদিও 'বিহযাদ' সেই সময় মৃত্যুবরণ করেছেন তথাপি তাঁর দুজন শিষ্য বিখ্যাত চিত্রশিল্পী 'মীর সায়িদ আলী' ও 'খাজা আব্দুস সামাদ' এর চিত্রকর্মের সাথে তিনি পরিচিত হন। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ূন যখন নির্বাসিত জীবন শেষে পারস্য হতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি উল্লিখিত দুইজন সাফাভী শিল্পীকে সংগে নিয়ে আসেন এবং তখন হতে ভারতবর্ষে মোগল চিত্রশিল্পের পদ্ধতিগত ও গুণগত অগ্রযাত্রা শুরু হয়। এখানে বলা দরকার, মোগল চিত্রকলার প্রাথমিক যুগ ছিল ইন্দো-পারস্য পর্যায়। পারস্য শিল্পীদের তত্ত্বাবাধনে ও অংশগ্রহনে স্থানীয় বহু চিত্রকর ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশে অংশ নেন। যেহেতু 'মীর সায়িদ আলী' ও 'খাজা আব্দুস সামাদ' পারস্য চিত্রকলার স্বর্ণযুগের অংশীদার সুতরাং তাদের নিয়ন্ত্রীত চিত্রকর্ম ঐ ধারার সাক্ষ্য বহন করবে তাতে আশ্চর্য

হওয়ার কিছু নেই। রঙ, উজ্জ্বলতা, আবহ, মোটিভ, অঙ্গসজ্জা সর্বপরি চিত্রাংকনের টেকনিক পারস্য হলেও স্থানীয় উপাদান বা রীতি গ্রহণে তাদের মধ্যে কোন কার্পন্যতা ছিল না। ফলে মোগল চিত্রকলা পারসিক ও ভারতীয় পরিবেশে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ভারতীয় চিত্রকলাতে *'মুরাক্কা'*র যে প্রচলন হয়েছে তা তাদের হাত ধরেই এবং সাফাভী রীতির পরবর্তী উত্তরসূরী হিসেবে মোগল চিত্রকলাতে এটি অনুপ্রবেশ করেছে।

*'মুরাক্কা'*র সর্বপ্রথম সূচনা মেলে হিরাত চিত্রশালায়। তৈমুরীয় চিত্রকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল এই হিরাত চিত্রশালায়। আমীর তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকার শাহরুখ (১৪০৪-৪৭ খ্রি:) হিরাতে রাজধানী স্থাপন করে চিত্রশিল্পের চর্চা শুরু করেন। রাজকীয় চিত্রশালার অসংখ্য চিত্রকর এখানে কাজ শুরু করেন এবং এদের মধ্যে গিয়াস উদ্দিন ও খলিল সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৪১৯ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দিন বিশেষ দূত হিসেবে চীনের সম্রাটের দরবারে যান ফলে তৈমুরীয় চিত্রকলা চীনা প্রভাবের সংস্পর্শে আসে। সুলতান শাহরুখের শিল্পানুরাগী পুত্র বায়সুনগুর মির্জার (মৃত্যু-১৪৩৩ খ্রি:) পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশিল্পে প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই সময় বায়সুনগুর এর একজন লিপিকার সর্বপ্রথম হস্তলিখন (calligraphy) সম্বলিত একটি *'মুরাক্কা'* বা অ্যালবাম এর সূত্রপাত করেন। লিপিকার জাফর বায়সানগুরী ছিলেন এর চিত্রকর ও সূচনাকারি। বস্তুত শাহরুখ ও বায়সুনগুর তৈমুরীয় চিত্রকলার যে ভিত্তি স্থাপন করেন পরবর্তীতে সুলতান হুসাইন মীর্জার রাজত্বকালে (১৪৬৮-১৫০৬ খ্রি:) তা স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়। সৌভাগ্যবশত এই সময়ই কামাল উদ্দিন বিহযাদের আবির্ভাব ঘটে এবং পারস্য চিত্রকলার পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রতিভাত হয়।

মোগল চিত্রকলায় *'মুরাক্কা'*র সূচনা হয় শাসকগণের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। সাধারণভাবে বলা হয় এই সময়কার চিত্র 'মিনিয়েচার' বা অনুচিত্র। প্রসঙ্গত ভারতবর্ষে মোগলদের আগমনের অনেক পূর্ব হতেই পুঁথিচিত্রণ শুরু হয়। বৌদ্ধ ও জৈন বিহারগুলোতে সুলতানি পূর্ব শাসনামলে বিভিন্ন চিত্র আঙ্গিক গড়ে ওঠে। কালক্রমে পারসিক চিত্রকলার অনেক রীতি-কৌশল পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্রে স্থান করে নেয়। মুসলিম মতাদর্শের মত অর্থাৎ পবিত্র কোরআনকে সজ্জিতকরণে যে পূণ্যকর্ম প্রাপ্তীর আশায় চিত্রকরগণ পবিত্র গ্রন্থকে সজ্জিত করতেন তেমনিভাবে নালন্দা ও বিক্রমশীল ইত্যাদিতে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি থেকে জানা যায় তারাও গ্রন্থের অনুলিপি ও সজ্জিতকরণ পূণ্যকর্ম বলেই মনে করতেন। এরপর সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভারতীয় চিত্রকলার আরেক পর্ব শুরু হয়। তালপাতার বদলে কাগজের উপর পুঁথিচিত্রণ শুরু হয়। এতদ্বসত্ত্বেও সুলতানি আমলের দরবারী চিত্রকলার বিবরণ তেমন একটা পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র 'নিমৎনামা' ও 'লৌরচন্দ্রার' সন্ধান মেলে। অবশ্য রত্নাবলী চট্টপাধ্যায় এর সাথে সুলতান নাসির উদ্দিন শাহ খলজীর জন্য তৈরি সাদির 'বুস্তান', মালবের একজন বিজ্ঞানীর লেখা

'অজর-অস-সানাই', নুসরাৎ শাহ এর জন্য রচিত 'সরফনামা' চিত্রনের উল্লেখ করেছেন।[১০] সুলতানি চিত্ররীতির এক অনন্য উদাহরণ এই 'সরফনামা' গৌড়ে রচিত একটি পুঁথি । এর প্রথম পৃষ্ঠায় নীল ও সোনালি রঙের নকসা লিপিতে উৎকীর্ণ আছে লিপিকারের নাম । আর আরবি ভাষায় লেখা আছে সুলতানের প্রশস্তি : 'সুলতানের আদেশে লেখা হয়েছে এই গ্রন্থ । সেই সুলতান পৃথিবী ও ধর্মের রক্ষক আবুল মুজাফর নুসরৎশাহ সুলতান হুসেন শাহর পুত্র । ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য চিরকালের জন্য রক্ষা করুন । তাঁর বংশধররা চির আয়ুষ্মান হোক । এই প্রার্থনা করেছে মহম্মদের পুত্র আহমেদ যাঁর নাম হামিদ খান, সুলতানের দুর্বলতম বান্দা । তারিখ হিজরি ৯৩৮ অর্থাৎ ১৫৩১-১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দ' ।

এর পর শুরু হয় মোগল শাসনামল। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর চিত্রশিল্পের বিকাশে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তবে তিনি কামাল উদ্দিন বিহযাদের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি নিজের রোজনামাচা 'তুজুক-ই-বাবুরি'তে বিহাযাদকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। মূলত মোগল চিত্রকলার সূচনা করেন বাদশাহ হুমায়ূন। তাঁর পারস্যে নির্বাসিত জীবন ও তৎপরবর্তী ক্ষমতায় ফিরে আসা মোগল চিত্রশিল্পের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। তিনি মীর সায়িদ আলী ও খাজা আবদুস সামাদ নামক পারস্যের এই বিখ্যাত শিল্পীদের দিয়ে নিজের সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে উপহার দিতে 'দাস্তান-ই-আমীর হামজা' চিত্রনের নির্দেশ দেন। আর বাদশাহ আকবর নিজেই এই দুইজন পারস্য শিল্পীর নিকট শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'রজমনামা', 'হরিবংশ' ও 'রামায়নের' মত গ্রন্থরাজী চিত্রন তত্ত্বাবধান করেন। প্রতিকৃতি চিত্রনের আগ্রহের কথা আবুল ফজল তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আকবর নিজের প্রতিকৃতি আঁকতে হুকুম দেন এবং তাঁর আমীর ওমরাদের নিয়ে একটি *'মুরাক্কা'* তৈরি করেন। দুর্ভাগ্যবশত এ্যালবামটি পাওয়া যায়নি।[১১] আকবরের চিত্রশালার চিত্রকর বড়কেশু এর চিত্রকর । জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল চিত্রকলা আরও উন্নত হয় এবং তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতার প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালাতে 'ফারুখ বেগ', 'ওস্তাদ মনসুর' ও 'ওস্তাদ আবুল হাসানকে' শিল্পী হিসাবে পান। তবে চিত্রশিল্পে তিনি পূর্ববর্তী রীতিপদ্ধতির পরিবর্তে স্বীয় অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটান। তাঁর সময়কার *'মুরাক্কা'* গুলোতে শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো একত্রিত থাকত। বাদশাহ শাহজাহান মূলত স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হোলেও তাঁর সময়ই কিছু বিখ্যাত *'মুরাক্কা'* চিত্রায়ন হয়। শাহাজাহান তাঁর আমীর আমত্যবর্গ ও অন্দর মহলের রমনীদের ছবি সম্বলিত সংকলনকে *'মুরাক্কা'*য় রুপান্তর করেন। শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো তাঁর স্ত্রীকে উৎসর্গ করে একটি *'মুরাক্কা'* তৈরি করেন। *'মুরাক্কা'* গুলোতে বহু হিন্দু-মুসলিম চিত্রকরগণ যৌথভাবে কাজ করে। পরিশেষে সম্রাট আওরঙ্গজেব এর সময় চিত্রকলার প্রতি বিরুপ মনোভাব ও ইউরোপিয় প্রাধান্য অনুপ্রবেশে মোগল

চিত্রকলার অধপতনের সূত্রপাত হয়। ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণ ও ধ্বংসের সময় বহু মূল্যবান এই ঐতিহাসিক নিদর্শন অনেকটা লুট হয়ে যায়। এতদ্বসত্ত্বেও মোগল যুগের বিখ্যাত দুটি সংগ্রহ *'মুরাক্কা-ই-গুলশান'* ও *'মুরাক্কা-ই-গুলিস্তান'* ইতিহাসের আকর উপকরণ হিসাবে আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

কেন গবেষণা :

আলোচ্য 'মোগল মুরাক্কা চিত্রণ : বিকাশ ও শৈলী' শিরোনামে গবেষণার একটি প্রেক্ষাপট আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে অনার্স ৩য় বর্ষে স্থাপত্য ও চিত্রকলা বিষয়ের সাথে আমরা সর্বপ্রথম পরিচিত হই। গতানুগতিক ঘটনা ও সাহিত্য নির্ভর ইতিহাস পঠন-পাঠনের বাইরে এই ধরণের বাস্তব প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিলাদীর চাক্ষুস উপস্থিতি আমাদের আশ্চার্যান্বিত করেছে। পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা দর্শনীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য, চিত্রকলা ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদী ইতিহাস রচনার সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। আদিম কাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল ইতিহাস রচনায় লিখিত ও কথিত উপকরণ সর্বাবস্থায় নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় মৌলিক ভূমিকা রাখতে পারে না। সুতরাং সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে টিকে থাকা উপকরণগুলোই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার সহায়ক।

ব্যবিলনীয়, এ্যাসিরিয়, কালদীয়, পারস্য, সিন্ধু যে সভ্যতার কথাই হোক মূখ্যত স্থাপত্য ও শিল্পকলার উপাদানই এর প্রধান উপকরণ। আর স্থাপত্যের আলোচনা আসলেই আবশ্যিকভাবে এর শৈল্পিক ও সৌন্দর্যবোধ প্রকাশে অলংকরণ, নকসা, ক্যালিগ্রাফী ইত্যাদির ব্যবহার অবশ্যাম্ভাবী ভাবে চলে আসে। শুধুমাত্র মাথা গোজার ঠাই অথবা সমাধি কিংবা স্বারক স্থাপত্য তৈরী করেই নির্মাতাগণ খ্যন্ত হননি উপরন্ত স্বর্গীয় আবহ ও মনোহরণ নক্সা ও কারুকার্যে তাকে করা হয়েছে শোভিত। মুসলিম শাসকগণ এহেন প্রশান্তিকে আরও বেশী আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তাদের শিল্পকলা চর্চায়। যুদ্ধ-বিগ্রহ, দখল-পরাজয়, সবকিছুকে ছাপিয়ে আভিজাত্য ও দরবারী মেজাজ প্রকাশে স্থাপত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য ইত্যাদিতে তাদের মনযোগ ছিল লক্ষ্যনীয়। মানুষের নৈমিত্তিক প্রয়োজন মিটিয়ে যদি উদ্বৃত্ত না থাকে তাহলে যেমন আভিজাত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না তেমনি শুধুমাত্র অর্থ সম্পদ থাকলেই শিল্পচর্চা সম্ভব নয়। প্রয়োজন হয় ঐতিহ্যগত পরমপরা, অনুসন্ধিৎসু মন, শিল্পচর্চার পরীক্ষীত ওস্তাগর, পরিবেশ এবং সর্বপরি মমত্ববোধ।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে অপরাপর শিল্পকলা মাধ্যমগুলোর ন্যায় মুসলিম চিত্রকলা অতি যত্নে ও রাজকীয় বদান্যতায় মধ্যযুগে পদার্পন করে। ভারতবর্ষের বাইরে যে চর্চা হয় তা প্রধানত মুসলিম শাসকদের হাত ধরে এখানে আসে। মুসলমানদের আগমনের বহুপূর্বে এখানে স্থাপত্য ও চিত্রকলার চর্চা হত। স্থানীয়

অধিবাসীগণ মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিল বিধায় মূর্তি বিনির্মান একটি পূণ্য ও স্বগীয় কাজ বলেই অবিহিত হত। অজন্তা-ইলোরাতে আমরা ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর চিত্রকলা ও ভাস্কর্য দেখতে পাই। একই ভাবে মন্দির বিনির্মাণ ও সজ্জিত করণে স্থানীয় শিল্পীদের দক্ষতা ও চিন্তাধারা অনুকরণীয় হয়ে আছে।

ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলা মূলত রাজসিক ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। ভারতীয় সভ্যতায় প্রাচীনকাল হতেই এগুলো বিদ্যমান ছিল। একই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় চিত্রকলার এক শক্তিশালী পূর্বসূরী পুঁথিচিত্রণ। খ্রিষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে মার্গীয় রীতির অনুপ্রেরণায় তালপাতার উপর বিভিন্ন ধর্মীয় ও লৌকিক কাহিনীকে খন্ড-খন্ড অথবা ধারাবাহিকভাবে চিত্র অথবা বর্ণনাতে প্রকাশিত হত। মার্গীয় রীতির এই ধারা প্রায় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। যদিও ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ঘটে অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে তথাপি তাদের কোন শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। মোহাম্মদ-বিন-কাশিম, সুলতান মাহমুদ প্রমুখ বিজেতাদের পথ ধরে ঘুর বংশ এবং তৎপরবর্তী সালতানাত ও পাঠান-মোগলগণ দীর্ঘসময় ধরে এই এলাকা শাসন করেন। মূলত ত্রায়োদশ শতকের প্রথম দিকে দাস বংশের মাধ্যমে একটি কার্যকরি ও শক্তিশালী মুসলিম শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তিনশত কুড়ি বৎসরের ঐ শাসনের অবসান হয় ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানি পথের যুদ্ধের মাধ্যমে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সময় যে পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা চলছিল তা মোগল শাসকদের প্রতি স্থানীয়দের আস্থাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে দেখা যায় সুলতানি ও মোগল শাসন ব্যবস্থা হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্তনকারী যুগ। সালতানাত শাসনামলে সীমিত আকারে চিত্রকলার চর্চা হোলেও স্থাপত্য বিনির্মাণে তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। আর মোগল শাসকগণ সেই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখে স্থাপত্য, চিত্রকলাকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। বাবুর হতে শাহজাহান পর্যন্ত তাদের শিল্পচর্চা অঙ্কুরিত হয়ে স্বর্ণশিখরে পৌঁছে। আর আওরাঙজেব হতে শুরু হয় এ অধপতন। এই পতন্মুখ সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে মোগল চিত্রকলা আঞ্চলিক ও বাজারী শিল্পকলাতে রুপ নেয়। দুর্ভাগ্যবশত বাদশাহ ও রাজন্যবর্গদের সংগ্রহগুলো বৃটিশ শাসনের গোড়াপত্তনে পৃথিবীর বিভিন্ন যায়গাতে লুটপাট ও চুরি হয়ে যায়। এমনকি তার মহামূল্যবান কোহিনুর হিরার মত সম্পদটিও বৃটিশদের হস্তগত হয় এবং তা ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায়। বস্তুত বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষকে যে আধুনিকতা উপহার দিয়েছে ঠিকই তবে শোষণ করেছ তার চাইতে ঢের বেশী। তাতেই ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের কীর্তিগুলো দেখতে এখন আমাদেরকে পরিদর্শন করতে হয় দূর পাশ্চাত্যের দেশগুলো।

মোগল চিত্রকলা মূলত মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র বা অনুচিত্র। পারস্য চিত্রকলা ও স্থানীয় চিত্রকলার রীতি ও শিল্পীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই চিত্র সম্ভার বাদশাহ আকবর হতে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হত। আধুনিক যুগে যেমন কোন বিশেষ দিন বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্মরণিকা প্রকশিত হয় তেমনি এগুলোও ছিল বিশেষভাবে প্রকাশিত চিত্র সম্বলিত এ্যালবাম বা *'মুরাক্কা'*। বিচ্ছিন্ন ভাবে চিত্রিত অনুচিত্র বা মিনিয়েচার সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং এ্যালবামে বা *'মুরাক্কা'*তে স্থান পাওয়া চিত্রকর্মগুলো স্বভাবতই অধিক তাৎপর্যবাহী। রাজকীয় চরিত্রগুলো, বিশেষ বিশেষ সর্ভাসদবর্গ, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ, ফুল, পশু-পাখি, হস্তলিখন ইত্যাদি *'মুরাক্কাতে'* সংগৃহীত হত। তাই পারস্য চিত্রকলা হতে মোগল চিত্রশালা পর্যন্ত এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সমাদৃত। ফলে চিত্রকলার এই পদ্ধতিটি নিয়ে আমার কৌতুহল বাড়তে থাকে। তখন বিভাগীয় অনুজ মাসুদ রানা খান এর সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক প্রফেসর নাজমা বেগম তিনি আমাকে কয়েকটি বই পড়তে বলেন। পরবর্তিতে তাঁর অনুপ্রেরণাতেই এই গবেষণা কর্মের প্রতি আগ্রহী হই এবং 'মোগল মুরাক্কা চিত্রণ' বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করি । আমার জানা মতে আজ অবধি এই বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন এম. ফিল ও পি.এইচ.ডি গবেষণা হয়নি যদিও দু'একটা প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে । যেহেতু মোগল *'মুরাক্কা'*র কোন আকর নিদর্শন বাংলাদেশেও নেই, ফলে মহান রাব্বুল আলামিনের উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র গবেষণাটি করার জন্য চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র

১. রফিকুল ইসলাম, *বিশ্ব সভ্যতা ও শিল্পকলা,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০১, পৃ. ১০

২. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৯, পৃ. ২১

৩. T.W Arnold, *Painting in Islam* (First Published, Oxford, 1920), New ed., New York, Dover Publications, 1865, p.10

৪. এ. বি. এম. হোসেন, *ইসলামী চিত্রকলা,* ঢাকা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৪, পৃ. ১৯

৫. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯

৬. Goetz, Harmann, *'The Early Muraqqa's of the Mughal Emperor Jahangir',* East and West_8, no.2 (July 1957), 157-158

৭. নাজমা খান মজলিস, *মুঘল মিনিয়েচারে হাশিয়া (১৫৫৬-১৬৫৮ খ্রি:),* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস পত্রিকা, পৃ. ২

৮. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২

৯. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২

১০. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরুপ : মুঘল চিত্রকলা,* কলিকাতা, থীমা প্রকাশনি, ১৯৯৯, পৃ. ১১

১১. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুরাক্কার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মুসলিম চিত্রকলাতে *'মুরাক্কা'* একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চিত্রকলা ও হস্তলিখন শিল্পের (calligraphy) সংগ্রহ পদ্ধতি । মুসলিম চিত্রকলার এক সোনালী যুগে রাজকীয় বদান্যতায় চিত্র সংগ্রহের এ্যালবামে শাসক ও আমত্যবর্গের পছন্দনীয় চিত্র ও হস্তলিখন এখানে একত্রকরা থাকত । পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই সংগ্রহকর্ম মুসলিম চিত্রকরগণ তৈমুরীয় চিত্রকলার যুগ হতে মোগল যুগ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এর ব্যাবহার করেন ।

ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী আমরা জানতে পারি, দশম এবং একাদশ শতকে মুসলিম চিত্রকলার উন্মেষ ঘটে । এসময় ফাতেমীয় শাসকগণ ও আব্বাসীয় শাসকগণ শিল্পকলার এই মাধ্যমটি পৃষ্ঠপোষকতা করেন । মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদিনের সময় ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও কঠোর অনুশাসনে চিত্রশিল্প আলাদা আঙ্গীকে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি । ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইসলামের সম্প্রসারণ যুগের সূচনা হয় । নতুন-নতুন দেশ ও সভ্যতার সাথে মুসলিমদের পরিচয় ঘটতে থাকে । ইসলামে যেখানে অনাড়ম্বর জীবন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হয় তার উপর ভিত্তি করে সাহাবিগণ সম্পদশালী হোলেও এই দর্শনে অবিচল ছিলেন । তথাপি ৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কাবাঘর পূণ নির্মাণে সর্বপ্রথম সৌন্দর্য্য বর্ধনে মর্মর পাথরে জিরকন কাঁচ সহযোগে মোজাইক ব্যাবহার করা হয় । প্রায় একই সময় কুফার শাসক উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ যে প্রসাদ তৈরী করেন তাতে বিভিন্ন জীব-জন্তুর চিত্রাবলীতে সুশোভিত ছিল ।[১] উমাইয়া শাসক প্রথম ওয়ালিদ ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে জর্ডান মরুভূমিতে ক্ষুদ্রাকার একটি প্রাসাদ 'কুসাইর আমরা' প্রতিষ্ঠা করেন । টি ডব্লিউ আরনল্ডের ভাষায় 'ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হোলে বলা যায় যে, উমাইয়া যুগে অধিকাংশ খলিফা ও সভাসদ ধর্মীয় বিধিনিষেধ অবজ্ঞার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বিবেকবর্জিত ছিলেন এবং 'কুসাইর আমরা'র প্রাচীর চিত্রাবলী চিত্রশিল্পের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতার জ্বলন্ত প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে' (ছবি নং ২.১) ।[২] যদিও আরনল্ডের এই মন্তব্যটি ঢালাওভাবে সকল মুসলিম

২.১ জর্ডানের 'কুসাইর আমরা', প্রাসাদে স্নানরত ফ্রেসকো চিত্র, Stock Photo, ৭১২-২৫ খ্রি:

শাসকগণের জন্য প্রযোজ্য নয় । কেননা, তখনও চিত্রশিল্পের প্রতি ইসলাম ধর্মের মনোভাব সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হয়নি । কুসায়ের আমরার ফ্রেসকো পদ্ধতিতে আঁকা চিত্রগুলোতে স্নান, রাশিচক্র, শরীরচর্চা, নর্তকী, রাজন্যবর্গ ইত্যাদি বিষয়ক চিত্রাবলী স্থান পেয়েছিল । লক্ষ্যণীয়, মুসলিম শাসকগণ বিজিত রাজ্যের স্থপতি ও শিল্পীদের এই কাজে লাগান যারা ছিলেন নেস্টোরিয়ান ও জ্যাকোবাইটস ধারার ওস্তাগর । উমাইয়া আমলে নির্মিত 'খিরবাতে-আল-মিনিয়া'(৭১২ খ্রি:), 'আনজার' (৮ম শতক) ,'হাম্মাম আস-সারক' (৭২৫-৩০ খ্রি:), 'খিরবাত আল-মাজফার' (৭২৪-৪৩ খ্রি:) ও 'মাসাত্তা'(৭৪৩ খ্রি:) এই সকল স্থাপত্যে ব্যাবহৃত চিত্রশিল্প মুসলিম শাসকদের মানুষিকতার পরিচয় বহন করে।

উমাইয়া যুগের অবসান হয় সম্প্রসারণবাদ মতাদর্শের উপর । তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান অথবা শিল্প-সাহিত্যর প্রতি যথেষ্ঠ উদাসীন ছিলেন । কিন্তু আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে থাকে । ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রীতি নির্ভরতা হতে মুসলমানগণ এক্ষণে ইরাণী ভাবধারাতে স্থানান্তরিত হতে থাকে । যার প্রধান কারণ ছিল রাজধানী দামেস্ক হতে বাগদাদে স্থাপন । আব্বাসীয় শাসকগণ ছিলেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী । বাগদাদ ও পরবর্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী সামাররাতে নির্মিত অসংখ্য মূর্তি তার স্বাক্ষর বহন করে । বাগদাদের গোলাকার নগরীতে গম্বুজগৃহে নির্মিত অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্তি অথবা আল-আমিনের পাঁচটি প্রমোদযানের অবয়ব তার সাক্ষ্য বহন করে । আব্বাসীয় আমলের বিখ্যাত স্থাপত্য 'জাওসাক আল-খাকানী'র (ছবি নং ২.২) চিত্রাবলীর মধ্যে মোটাসোটা দেহ বিশিষ্ট গৃহপরিচারিকা নতজানু হয়ে মদ পরিবেশন করছে আবার কোথাওবা অর্ধ-অনাবৃত নর্তকী নৃত্যরত অবস্থায় রয়েছে । ভগ্নদশা হতে উদ্ধার করা তৈজষপত্রের মধ্যে জীবন্ত পশু-পক্ষির চিত্র সম্বলিত পানপাত্র বিশেষভাবে উল্ল্যেখযোগ্য । ৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বালুকুয়ারা' প্রাসাদে ষ্টাকোর অলংকরণ ব্যতীত সোনালী ফ্রেসকো চিত্রের ব্যাবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । ভাইওলেটের মতে- 'সামাররার শিল্পকর্ম হেলেনিষ্টিক, সিরোকপটিক এবং ইন্দো-পারস্য শিল্পকলার মিলনকেন্দ্র এবং এর ফলে মুসলিম শিল্পকলার উদ্ভব হয়' ।[৩]

২.২ জাওসাক আল খাকানী, নৃত্যরত মহিলা ফ্রেসকো চিত্র, Wikipedia, ৮৩৬ খ্রি:

মিশরে ফাতেমীয় শাসকদের রাজত্বকালে খলিফা আল-মুসতানসীর ও মন্ত্রী ইয়াজুরী রাজ্যের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। সে সময়কার বিখ্যাত দু'জন শিল্পী ইরাকের ইবনে-আজিজ ও মিশরের চিত্রকর আল-কাসিরের মধ্যে নর্তকীর চিত্রাংকনে প্রতিযোগিতা হয়। বলা বাহুল্য এত নিপুণ হাতে নর্তকীর চিত্র অংকীত হোল যেখানে একজনের চিত্রে মনে হচ্ছিল প্রাচীর গাত্রে তিনি বিলীন হোচ্ছে আর অপরটিতে বের হয়ে আসছে। মুসলিম চিত্রকলার সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ 'খিতাত' এর লেখক মাকরিজীর[৪] বক্তব্য অনুযায়ী ফাতেমীয়দের সময় চিত্রশিল্পের প্রভুত উন্নতি হয়। তবে উল্লেখিত কোন শিল্পকর্ম দূর্ভাগ্যবশত পাওয়া যায়নি। কিন্তু আর্চডিউক রাইনারের সংগ্রহে ভিয়েনার জাতীয় গ্রন্থাগারে যে চিত্রাবলী সংরক্ষিত আছে তা মুসলিম চিত্র শিল্পের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত সমূহের অন্যতম।

একাদশ ও দ্বাদশ শতক আব্বাসীয় শাসনামলের এক বিশেষ অধ্যায়। সেলজুক বংশ ইরাক ও পারস্যে সুলতান মালিক শাহের নেতৃত্বে চারু ও কারু শিল্পের প্রভুত উন্নতি সাধন করে। এর নিদর্শন বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রাপ্ত ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে চিত্রিত জীব-জন্তুর চিত্রাবলী উল্লেখযোগ্য। ভ্যাটিকান ও বৃটিশ মিউজিয়ামে আরও কিছু চিত্রাবলীর নিদর্শন রক্ষিত আছে। উল্লেখ্য এ সময় খ্রিষ্টান বাইজানটাইন শিল্পরীতি ও সেলজুক 'মিনাই' ভাবধারাতে বাগদাদে নতুন ধারার সূচনা হয়। খলিফা মালিক শাহের একজন বিশ্বস্ত রাজন্য ও মন্ত্রী নিযাম-উল-মুলকের কর্মকৌশলে চিত্রকলা, স্থাপত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। 'এ সময় প্রাচীন পারস্য সভ্যতার উপাদান মুসলিম চিত্রকলাতে অনুপ্রবেশ করে'।[৫] কালক্রমে বাগদাদ, মসুল ও দিয়ারবকর চিত্রশালাতে মেসোপটেমীয় শিল্পরীতির বিকাশ ঘটে। ডায়স্করাইডসের 'মেটেরিয়া মিডিকা', গ্যালনের পান্ডুলিপি, 'কালিলা ওয়া দিমনা' (ছবি নং ২.৩) প্রভৃতি পান্ডুলিপি চিত্রিত হতে থাকে।

২.৩ কালিলা ওয়া দিমনা, মেসোপটেমিয় চিত্রশালা, বিবলিউথিক মিউজিয়াম, প্যারিস, ১২৩৬-৪০ খ্রি:

পৃথীবির ইতিহাসে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণ এক জঘন্যতম ও নারকীয় ঘটনার জন্ম দেয় । প্রতিষ্ঠিত হয় ইলখানি রাজ বংশ । রাজধানী বাগদাদ হতে তাব্রিজে সরিয়ে নেয়া হয় । ফলে পারস্য ও মেসোপটেমীয় আধিপত্য শুরু হয় । শাসক গাজান খান এবং তাঁর মন্ত্রী রশিদ উদ্দীনের ইচ্ছানুযায়ী চিত্র শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় । তন্মধ্যে তাব্রিজ চিত্রশালাতে খ্রিষ্টিয় বাইজানটাইন রীতি কৌশলের স্থলে চীনা বা দূরপ্রাচ্যর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । ইবনে বখতিসুর ‘মানাফি আল-হাইওয়ান’ পান্ডুলিপির চিত্রায়নে সে প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বিশেষত মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে রক্ষিত এক জোড়া টিয়া পাখির চিত্র এবং ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ ইবিক্স দেখে মনে হয় এটা কোন চীনা চিত্রকরের কর্ম । আল বেরুনীর ‘আসার-আল-বাকীয়া’ অনুকরণে চিত্রিত ‘আহরিমার সাথে মাসা ও মাসায়ানা’, ‘রাসুল (সা.) আলী (রা:) কে উত্তরাধীকার ঘোষনা করেছেন’- ছবিগুলো এডিনবরা ও প্যারিসে সংরক্ষিত আছে । ব্যারেটের মতে ‘চিত্রের মূল কথা হচ্ছে তাদের মৌলিকতা, আর যে সমস্ত চিত্রকর এই চিত্রগুলো অঙ্কন করেন তারা মোঙ্গাল সুলতানদের মর্যাদা সম্মন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তাঁদের চিত্রাবলীতে অনুরূপ রাজকীয় মর্যাদা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই ব্যাবহার করেছিলেন’।[৬] এডিনবরা অথবা রয়াল এশিয়াটিক থেকে প্রকাশিত কোন পান্ডুলিপিতেই মিনিয়েচার ব্যাতিত জমকালো এ্যালবামের সংগ্রহ চোখে পড়ে না । ইরাণের বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক ফেরদৌসির ‘শাহানামা’ পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহে রয়েছে । ডাবলিনের চেষ্টারব্যাটী অথবা বোষ্টন মিউজিয়ামে রক্ষিত পান্ডুলিপির কপিগুলো শিল্পমানের দিক থেকে কালোত্তীর্ণ । এই সকল সংগ্রহে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় একই পৃষ্ঠায় দুই অথবা তিনটি ক্ষুদ্রাকার চিত্র । ব্যারেট মিউজিয়ামে রক্ষিত পান্ডুলিপির চিত্রাংকনে লক্ষ্য করা যায় যে, ‘ইসফেন্দিয়ার ল্যাসোর সাহায্যে গুরশাপকে ধরাশায়ী’ (ছবি নং-২.৪) করবার দৃশ্যের চিত্রপটটি খুবই ক্ষুদ্র, ছয় কলামে টেক্সট লিখিত হয়েছে, পাতাদ্বয় টেক্সট এবং মার্জিন ভেদ করে সীমানার বাইরে চলে গেছে । সুন্দর পরিপাটি, উজ্জ্বল রঙের ব্যাবহার বিশেষ করে সোনালী পটভূমিতে মণিমানিক্যর মত উজ্জ্বল প্রতিকৃতি সমূহ, প্রাণবন্ত

২.৪ ইস্ফেন্দিয়ার গুরশাকে ধরাশায়ি করা, শাহানামা, বৃটিশ মিউজিয়াম, প্যারিস, ১৩৩০-৫০ খ্রি:

অশ্বারোহী দল, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র লতাপাতা প্রভৃতিতে মেসোপটেমীয় প্রভাব থাকলেও যোদ্ধাদের শিরোস্ত্রাণ, বর্ম ইত্যাদিতে মোঙ্গল উপাদান রয়েছে'।[৭] নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত 'ইসফেন্দিয়ারের শবযাত্রার' চিত্র গোটা পারস্য চিত্রকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'কালিলা-ওয়া দিমনা'তে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা তৈমুরীয় চিত্রকলাতে পরবর্তিতে পরিলক্ষিত হয় । বিশেষত প্রাকৃতিক দৃশ্য বিন্যাসে পারস্য প্রেক্ষাপট ও অলংকারিক ব্যবহার সচেতন ভাবে হোতে থাকে । আর জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি অংকনে বাস্তবধর্মী শিল্পরীতি ব্যাবহৃত হয় । চিত্রের পৃষ্ঠার বর্ডার অতিক্রম করে সেখানে ক্ষুদ্রাকৃতির অপরাপর অনুসংগ যথাযথভাবে উপস্থিত হয় । ইলখানি চিত্রকলার অন্য একটি স্কুল সিরাজ । ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ শাহের রাজত্বে বেশ কয়েকটি পান্ডুলিপি এখানে চিত্রায়িত হয় ।

ইলখানি বংশের সর্বশেষ শাষক আবু সাঈদ ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর পর ইরাক ও পশ্চিম পারস্যে জালাইরী বংশের আবির্ভাব ঘটে । এই বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা উয়াইস[৮] তাব্রিজ ও বাগদাদ দখল করে এবং তাদের পুত্রদ্বয় আহমেদ ও হুমায়ুনের[৯] শাসনামলে চিত্রকলার প্রভূত উন্নতি হয় । তাব্রিজ ও বাগদাদ চিত্রশালাতে চিত্রকর্মের পরিচর্যা শুরু হয় । এই সময়কার চিত্রিত কাযউইনীর 'আজাইব-আল-মখলুকাত', রশীদ উদ্দীনের 'মোঙ্গল জাতির ইতিহাস', খাজু কিরমানির 'দিওয়ান' উল্লেখযোগ্য।

২.৫ রাজকুমার হুমাই ও হুমায়ূন, হিরাত চিত্রশালা, খামসা, বৃটিশ মিউজিয়াম, ১৩৯৬-১৪৩০ খ্রি:

বলা হয়ে থাকে 'দিওয়ানের' চিত্রায়ন ব্যাতিরেখে তৈমুরীয় চিত্রকলার উদ্ভব হোত কিনা সন্দেহ । প্রাচীন সনাতনী মেসোপটেমীয় পদ্ধতি অথবা চীনাদের অনুকরণে একই রঙের রেখান্ককনরীতি এখানে অনুপস্থিত । চিত্রকর ও ঐতিহাসিক দোস্ত মোহাম্মদ তাঁর রচনাতে উল্লেখ করেছেন- আহমদ মুসা, শামসুদ্দীন, আব্দুল হাই এবং জুনাইদ নাক্কাশের কর্ম কৌশল ব্যতিত জাতীয় পারস্য রীতির সূচনা হোতনা । ব্যারেট যথার্থই মন্তব্য করেছেন-'এটা তৈমুরীয় যুগের প্রথম সর্বোৎকৃষ্ঠ পান্ডুলিপি, যা পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈমুরী শিল্পানুরাগী বংশধরদের চিত্রশালায় নিযুক্ত চিত্রকরদের অসামান্ন কৃতিত্বের পূর্বাভাস দেয়'। ইলখানী চিত্রশিল্পে মোঙ্গলীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রভাব

থাকলেও কিরমানির চিত্রাবলীতে সর্বপ্রথম পারস্যকরণ চিত্রধারার উন্মেষ হয় । দোস্ত মোহাম্মাদের ভাষায়- জালাইরী শাসনামলে বাগদাদে আধুনিক পারস্য চিত্রকলার উন্মেষ ঘটে ।[১০] 'রাজকুমার হুমাই ও রাজকুমারী হুমায়ুন এর ভালবাসার দৃশ্য' এর একটি অনন্য উদাহরণ (ছবি নং ২.৫) । প্যারিসের আর্টস ডেকোরেটিভ যাদুঘরে রক্ষিত প্রতিকৃতি গুলির অংকণ রীতি এতই ধ্রুপদি ছিল যে- ইতিপূর্বে অঙ্কিত সকল প্রতিকৃতি অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা সামন্জস্যপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় । চিত্র এবং টেক্সটের যে অনবদ্য ভারসাম্য তা মীর আলীর অবদান । জালাইরী শাসনামলে সর্ব প্রথম *'মুরাক্কা"*র সূত্রপাত হয় বলে যে ধারণা কথিত আছে তার কোন অস্তিত্ব আমরা খুজে পাই না । পরন্তু মুসলিম চিত্রকলা ক্রমান্বয়ে একটি পরিণত পর্যায়ে উত্তরণের পূর্বাভাস লক্ষ্যণীয় ।

১৩৫৬ থেকে ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিরাজ ও ইস্পাহানে মুজাফফরী রাজবংশ আধিপত্য বিস্তার করে । তাদের শাসনামলে চিত্রশিল্পের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয় । তোপকাই সরাই মিউজিয়াম ইস্তাম্বুলে রক্ষিত 'শাহানামা', বিবলিউথিক ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত 'কালিলা ওয়া দিমনা' অথবা টারকিস এন্ড ইসলামি আর্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত 'কবিতা সংকলন' সমূহ পান্ডুলিপি আকারে যত্ন সহকারে চিত্রিত হয় । তবে এই সময় প্রতিকৃতি বিহীন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর যে চিত্রায়ন হয় তা মুজাফফরী চিত্রকলাকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে । এ ক্ষেত্রেও *'মুরাক্কা'*র মত কোন চিত্রকলার সংগ্রহের প্রামাণিক দলিল আমরা দেখতে পাই না ।

মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাস তৈমুরীয় চিত্রশালা ব্যাতিত *'মুরাক্কা'*র নিদর্শন প্রায় অসম্ভব । চিত্রকলার ইতিহাস যখন থেকেই শুরু হোক না কেন কালে-কালে এর উৎকর্ষতায় অনেক শাসক, পৃষ্ঠপোষক, চিত্রকর কাজ করেছেন । আর মুসলিম চিত্রকলার বিকাশ ও উন্মেষে ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ৭ম শতক[১১] হতে তার রেনেসাঁসের সূত্রপাত ঘটে শাসক আমীর তৈমুরের সময় । তৈমুরী চিত্রকলার ব্যাপ্তী ছিল ১৩৮৬ হতে ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত । তবে ১৩৮৬ হতে ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমীরে তৈমুর ইরাক ও পারস্য জয় করে সেখানকার সকল চিত্রকর ও ওস্তাগরদের যারা বাগদাদ এবং সিরাজে ছিলেন তাদের সমরকন্দে নিয়ে যান । নতুন পরিবেশ ও সাম্রাজ্যে শিল্পীগণ তাদের কর্মকৌশল শুরু করেন । শুরুতে বিখ্যাত কোন চিত্রায়িত পান্ডুলিপি হয়েছে বলে তেমন উদাহরণ চোখে পড়ে না । এই সময় চীনা রীতির অনুস্বরণে কয়েকটি মিনিয়েচার চিত্রায়নের কথা বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় । মুসলিম চিত্রকলার পূর্ববর্তী পান্ডুলিপি ও বিক্ষিপ্ত চিত্রগুলোতে চীনা প্রভাবের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । বিশেষত সূক্ষ আঁচড় ও রৈখিক প্রাধান্য নির্ভর চিত্রকলার যে প্রচলন মুসলিম চিত্রকরগণ করেছেন তা চীনা প্রভাবেই সম্ভব

হয়েছে । চীনারা চিত্রাঙ্কনে এক ধরণের ব্রাশ ব্যাবহার করতেন যা পাখির পালকের তৈরী । এতে রঙের প্রাচুর্যতা থাকত না, হালকা রঙের ওয়াশের উপর বা প্রলেপের উপর নিবের সাহায্যে একরঙা কালি দিয়ে ছবি আঁকতেন ড্রয়িং ও স্কেচের মাধ্যমে । সুতরাং প্রথম দিককার চিত্রে চীনা প্রভাব লক্ষ্যণীয় । এই সময়ে চিত্রকলার ইতিহাসকে অবাক করে একটি *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবাম এর সূচনা হয় । এই এ্যালবামের চিত্রগুলো ছিল অসংলগ্ন কয়েকটি চীনা রীতি নির্ভর চিত্রের সংগ্রহ । অবশ্য এ্যালবামটিতে কি কি চিত্র ছিল তার তেমন কোন নির্ভরশীল তথ্য না পেলেও এগুলো আব্দুল হাই অথবা তার সমসাময়িক চিত্রকরদের কারো কাজ হতে পারে । উল্লেখ্য চিত্রকর আব্দুল হাই ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর জুনাইদ নাক্কাশের ওস্তাদ । তাই *'মুরাক্কা'*র এই অভিনব সংকলন পদ্ধতি তৈমুরীয়দের সময়কাল হতে যাত্রা শুরু করল । এ সম্পর্কে অন্য একটি তথ্য হচ্ছে- ইস্তাম্বুলের তোপকাপু লাইব্রেরীতে যে এ্যালবামের বা '*মুরাক্কা'*র সংগ্রহ রয়েছে তা কোন জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ভর বিখ্যাত গ্রন্থের চিত্রাবলী । লক্ষ্যণীয়, এই চিত্রায়নে স্থাপত্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ।

আমীরে তৈমুর ১৩৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাব্রিজ অধিকার করে নেওয়ার পর কারা ইউছুফ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় । কালক্রমে এই বংশের উত্তরাধীকার দুই ভাই ইসকেন্দার ও জাহান শাহ পালাক্রমে ক্ষমতায় আসেন । যাই হোক, এই সময় তাব্রিজে যে শিল্পচর্চা হয় তাতে পূর্ববর্তী জালাইরী চিত্রকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । কেভারকিয়ান সংগ্রহে 'শাহনামা'র যে পান্ডুলিপি রয়েছে তাতে তৈমুর তাঁর সভাসদদের নিয়ে তাবুর সম্মুখে সুদৃশ্য একটি কার্পেটের উপর বসে আছেন । চিত্রটিতে তাব্রিজের গতানুগতিক চিত্ররীতির ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় । বিবলিউথিক ন্যাশনাল প্যারিসে 'শাহনামা'র অপর যে সংগ্রহ তার প্রতিকৃতি গুলো আড়ষ্ট ও অনড় ধরণের । যদিও চীনা রীতির বাইরে এসে এখন মুসলিম চিত্রকরগণ উজ্জ্বল রঙের ব্যাবহার ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন । ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্ট, ওয়াশিংটনের সংগ্রহে পারস্যের জাতীয় কবি শেখ নিজামীর অমর কীর্তি 'খসরু ও শিরিন' তৈমুরী চিত্রকলার অন্যতম নিদর্শন । আগা ওগলু কর্তৃক প্রকাশিত পাঁচটি বিখ্যাত চিত্র রয়েছে । এর

২.৬ খসরু শিরিন মৃগয়া, তাব্রিজ চিত্রশালা, ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্ট, ১৪৪০-৬০ খ্রি:

মধ্যে ‘খসরু শিরিনকে স্নানরত অবস্থায় দর্শন’, ‘মৃগয়া’ (ছবি নং ২.৬), ‘ফরহাদকে শিরিনের সম্মুখে হাজির করা’ ইত্যাদি চিত্রাবলী রয়েছে। শেষোক্ত ছবির দৃশ্যে ফরহাদকে যখন শিরিনের সম্মুখে আনা হয় তখন শিরিনের যে অভিব্যাক্তি তা অতুলনীয়। চিত্রের তিনটি দরজা ও দুইটি জানালার মধ্য দিয়ে শিরিনের সখীদের যে কৌতুহলী চেহারা তাতে উক্ত জুটির মিলন দৃশ্যকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এখানে পারস্য চিত্রকরগণ ঐতিহ্যগত স্থাপত্য ও কার্পেটের নক্সাকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুত এই সকল চিত্রাবলী কোন না কোন ‘*মুরাক্কা’* বা এ্যালবামের অংশ বিশেষ। কিন্তু কালের যাত্রায় তার আদি স্থানকে আর চিন্হিত করা সম্ভবপর হচ্ছেনা।

১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে শাহরুখ তাঁর পুত্র ইব্রাহিম সুলতানকে সিরাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর শাসনামলে সিরাজ চিত্রশালার মাধ্যমে অসংখ্য পান্ডুলিপির চিত্রায়ন হয়। এই সময় বিখ্যাত লিপিকার মাহমুদ ইবনে মুর্তাজার হস্তলিখন সম্বলিত চিত্রাবলী এর মাত্রাগত ও গুনগত মান বহু গুন বাড়িয়ে দেয়। গুলবেনকিয়ান অথবা বৃটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহ যে ‘কবিতা সংকলন’ তার গুনগতমান মোঙ্গলরীতিকে ছাপিয়ে পারস্য রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। বডলিন লাইব্রেরীতে রক্ষিত ‘শাহনামা’র একটি চিত্রে ‘ঘুমন্ত রুস্তমের কক্ষে তাহমিনার অগমন’ দৃশ্যটি সিরাজ চিত্রশালার অনবদ্য চিত্রায়ন। চিত্রটি পীর আহমেদ বাগশীমালীর অঙ্কিত এবং স্বাক্ষর সম্বলিত। ভীভার সংগ্রহে খাজু কিরমানীর ‘খামসা’তে একটি নতুনমাত্রা নিয়ে ‘নামপত্র’ প্রকাশের একটি উদাহরণ এই সময় লক্ষ্যনীয়।[১২] একই সাথে মুসলমানদের স্থলযুদ্ধের অসংখ্য উদাহরণ ও চিত্রায়ন থাকলেও এই সময় ‘সমুদ্র যুদ্ধের’ একটি চিত্রায়ন হয়। ১৪৩০ থেকে ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নিজামীর ‘খামসা’ ক্লড আনেট, উপশালা রয়েল ইউনিভার্সিটি এবং চেষ্টারবেটী সকল সংগ্রহের চিত্রায়নে *‘মুরাক্কা’*র আলাদা কোন সংগ্রহ ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত হয়নি।

আমীরে তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহরুখ হিরাত কেন্দ্রীক চিত্রশিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু করেন। সমসাময়িক বিখ্যাত চিত্রকর গিয়াসউদ্দীন ও খলিল তাদের শিষ্যদের নিয়ে রাজকীয় চিত্রশালাতে কাজ শুরু করেন। রাজকীয় তত্ত্বাবধানে তখন চীনা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শাহরুখের মৃত্যুর পর রাজপুত্র বায়সানগুর মির্জা এর তত্ত্বাবধান শুরু করেন। এ সময় শিল্পী জাফর বায়সানগুর অসংখ্য পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। কালক্রমে তৈমুরী চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতায় আসেন সুলতান হুসাইন মির্যা এবং তার সুযোগ্য মন্ত্রী মীর আলী শের নেওয়াই। বলা বাহুল্য যে শেষোক্ত শিল্পরসিকদ্বয় ব্যাতিত পারস্য চিত্ররীতির চরম উৎকর্ষ অসম্ভব ছিল।

হিরাত চিত্রশালায় প্রাথমিক যুগে নৈতিক উপদেশ সম্বলিত ‘কালিলা ওয়া দিমনা’ চিত্রিত হয় । গুলিস্তান প্যালেস, তেহরানে সংরক্ষিত ত্রিশটি চিত্র সম্বলিত এই পান্ডুলিপিটি বায়সানগুরের জন্য তৈরী করা হয় । প্রখ্যাত চিত্রকর খলিল এই কর্মটি সম্পাদন করেন । এর উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলোর মধ্যে ‘বৃদ্ধ বানর রাজা ডুমুর গাছ থেকে কাছিমের জন্য ফল ফেলছে’ (ছবি নং ২.৭), ‘বক-কাঁকড়া ও মাছের গল্প’, ‘ব্যাধের পাখি শিকার’ অন্যতম । দ্বিতীয় চিত্রটি খলিল রেখার বলিষ্ঠ আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন । চিত্রে বক কাঁকড়াকে বলেছিল যে, জেলে পুকুরে জাল ফেলবে এবং কাঁকড়া যেন অনত্র চলে যায় । এতে বক সুযোগ বুঝে মাছ ধরে খাবে । কিন্ত কাঁকড়া বকের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরে তাকে দংশন পূর্বক হত্যা করে । প্রথম বারের মত লক্ষ্যনীয় যে- প্রতিকৃতি বিবর্জিত চিত্রগুলো চিত্রকরদের মনের অভিব্যক্তিকে প্রকাশে সক্ষম । বস্তুত এর প্রতিফলন আমরা মোগল চিত্রশিল্পে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের চিত্রশালাতে প্রতিফলতি হয় ।

২.৭ বৃদ্ধ বানর ও কাছিম, কালিলা ওয়া দিমনা, বিবলিউথিক মিউজিয়াম, প্যারিস, ১৪৯০ খ্রি:

১৪২৯-৩০ খ্রিষ্টাব্দে চিত্রিত ‘শাহানামা’ যা বর্তমানে গুলিস্তান প্যালেসে সংরক্ষিত রয়েছে । নামপত্রসহ ২০টি মিনিয়েচার সম্বলিত এই পান্ডুলিপিটি পারস্য চিত্রকলার ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে পরিগনিত । নামপত্রটিতে মৃগয়ারত বায়সানগুর মির্যার যে প্রতিকৃতি দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী চিত্রিত হয়েছে তাতে সুলতান অশ্বপৃষ্ঠে বসে মৃগয়ার দৃশ্য অবলোকন করছেন । একজন অশ্বারোহী ভৃত্য যুবরাজের মাথায় ছাতা ধরে আছে আর যুবরাজ মদ্যপানরত অবস্থায় সঙ্গীত উপভোগ করেছেন । অশ্বারোহী শিকারিগণ হরিণ, শৃগাল, ভল্লুক, খরগোশ ইত্যাদি বন্যজন্তুদের বধ করছেন । ক্লাসিক্যল পারস্য পাটভূমিতে বৃহৎ কলেবরের এই নামপত্রটি সম্ভবত শ্রেষ্ঠ মৃগয়ার দৃশ্য । প্রতিকৃতি অংকনে অভিব্যক্তি, নিজস্বতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা নিখুৎভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । একই সাথে প্রকৃতির দৃশ্যগুলো বাস্তবধর্মী ও প্রাণবন্ত । এই সময় বিবলিউথিক ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত ‘মিরাজনামা’র (১৪৩৬ খ্রি:) পান্ডুলিপি, চেষ্টারবেটির সংগ্রহ ‘তাবারীর ইতিহাস’ (১৪৬৯ খ্রি:) এবং সুলজ এর অন্য একটি ‘শাহনামা’র সংগ্রহ । উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা পান্ডুলিপির চিত্রায়নে *‘মুরাক্কা’*র কোন আলাদা সংগ্রহ নেই । তবে পান্ডুলিপির পৃষ্ঠাতে বিশেষ বিশেষ চিত্রকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ।

তবে *'মুরাক্কা'*র আবির্ভাব সুলতান হুসাইন মির্জার রাজত্বে ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিক ভাবে প্রমানিত। তিনি ১৪৬৮-১৫০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন মন্ত্রী মীর আলী শের নেওয়াই। এই ধারণার অবশ্য একটি যৌক্তিকতাও রয়েছে। কেননা, যুগের বিস্ময় ও প্রাচ্যের রাফায়েল কামাল উদ্দীন বিহযাদের শিল্পকর্ম চর্চা ইতোমধ্যেই প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে খ্যাতি লাভ করেছে। সুতরাং ক্ষণজন্মা এই চিত্রকরের হাতে এমন একটি শিল্পকর্ম কৌশল আবিস্কৃত হওয়া আশ্চর্য্যের কোন বিষয় নয়।

কামাল উদ্দীন বিহযাদের শিল্পচর্চার কাল আমরা তিনটি ভাগে দেখতে পাই। প্রথমত ১৪৬৮-১৫০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান হুসাইন বায়কারার অধীনে ও তত্ত্বাবধানে হিরাত একাডেমির পরিচালক রুপে, দ্বিতীয়ত ১৫০৭-১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উজবেক সুলতান সায়বানি খানের অধীনে শিল্পচর্চা এবং তৃতীয়ত ১৫১০-১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সাফাভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাঈল সাফাভির অনুপ্রেরণায় সাফাভী চিত্রকলার সূত্রপাত করা। বিহযাদের মৃত্যুর সঠিক তারিখ না জানা থাকলেও তাঁর মৃত্যু যে ১৫২২ থেকে ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দ এর মধ্যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে শাহ ইসমাঈলের পুত্র শাহ তাহমাসপ সাফাভি সিংহাসনে আরোহন করলে মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। পিতার যে রাজকীয় চিত্রশালা তাতে বিহযাদ ও তাঁর যোগ্য শিষ্যদের নিয়ে শিল্পচর্চা করার দূর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেন (ছবি নং ২.৮)।

২.৮ ইউসুফ জুলেখাকে প্রলুব্ধ করা, বিহজাদ, বুস্তা, হিরাত, ইজিপশিয়ান লাই: কায়রো, ১৪৯২ খ্রি:

চিত্র সমালোচক ও প্রকাশক ব্লচেট সুলতান হুসাইন মির্জার সময় চিত্রিত 'দিওয়ান' (১৪৮৬ খ্রি:) এর কয়েকটি চিত্র প্রকাশ করেন। বর্তমানে বিবলিউথিক ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত 'দরবারে সমাসীন সুলতান হুসাইন মির্জার প্রতিকৃতি' কামালুদ্দিন বিহযাদ এর স্বাক্ষর সম্বলিত। অশ্বারোহীর ঢালের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি হরফে অস্পষ্টভাবে 'আল ফকীহ বিহযাদ' বা অধম বিহযাদ লিখিত রয়েছে। এই সময় ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে চিত্রিত নিজামীর 'খামসা' যা বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাতে বাইশটি মিনিয়েচার রয়েছে। সুলতান আলী মির্জা বারসালকে[১৩] বিখ্যাত চিত্রকর 'রুহুল আল্লাহ মিরাক

নাক্কাশ' চিত্রন করেছেন এবং তাঁর স্বাক্ষরও রয়েছে। চিত্রটি উপহার হিসেবে প্রদানের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়।

মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাস রচয়িতার মধ্যে পারস্য ইতিহাসবিদ খন্দমীর (জন্ম ১৪৭৫ খ্রি:) অন্যতম। বিহযাদের সমসাময়িক এই ইতিহাসবিদের লিখিত একটি মুখবন্ধ বিহযাদের এ্যালবামে সংযোজিত হয়েছে। খন্দমীর যে মন্তব্য তা অনেক চিত্র সমালোচক তীর্যক ভাবে ব্যাক্ত করেছেন। তথাপি ক্ষণজন্মা এই চিত্রকরের বৈচিত্রতা ও সৃষ্টিশীলতকে লোক সম্মুখে উন্মোচিত করার বিষয়ে তিনি কোন কার্পন্য করেননি। তাঁর মন্তব্যটি আরনল্ড ও বেভারেজ কর্তৃক অনুদিত 'বাবুরনামা'তে উল্লেখ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে –'শিল্পী কামালুদ্দীন বিহযাদ মণির তুলির মত পৃথীবির সকল চিত্রকরদের স্মৃতিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে এবং অসাধারণ গুণে গুণান্বিত তাঁর আঙুলগুলো আদম সন্তানদের মধ্যে সকল চিত্রশিল্পীর শিল্পকর্মকে নিশ্চিন্হ করে দিয়েছেন'।[১৪] খন্দমীর অবশ্য এই কৃতিত্বের জন্য তাঁর ওস্তাদ আমীর নিযাম উদ্দীন আলী শের এবং খাকান সম্রাট হুসাইন বায়কারার পৃষ্ঠপোষকতার ভূয়সি প্রসংশা করেছেন। বাদশাহ বাবুর তাঁর আত্নচরিতে ক্ষণজন্মা বিহযাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে- 'তিনি শ্মশ্রুবিহীন মুখাবয়াব অঙ্কন করতে কিছুটা প্রলম্বিত করতেন , তবে শ্মশ্রুসম্বলিত মুখাবয়াব অঙ্কনে বিহযাদের পারদর্শিতাকে অতুলনীয়' বলেছেন।[১৫]

মুরাক্কা

'মুরাক্কা' একটি আরবি ও তুর্কি শব্দ। শাব্দিক ভাবে চিত্রাংকন সম্বলিত একটি বই যা দরবারি শিল্পী দ্বারা চিত্রিত ও নমুনা ক্যালিগ্রাফি (হস্তলিখন শিল্প) দ্বারা অলংকৃত। এছাড়াও বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাজের সন্নিবেশ। ইসলামিক চিত্রকলা এবং লিখন বিদ্যার এটি একটি সংকলন যেটি সম্রাট নিজেই তাঁর তত্ত্বাবধানে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এটি কোন লিখিত পুঁথির চিত্রায়ন নয়। কার্যত এটি একটি পুস্তিকা আকারে চিত্র প্রদর্শনি এবং অবশ্যই স্হানান্তর যোগ্য। চিত্র সংগ্রহের এই পদ্ধতিটি মুসলিম বিশ্বের চিত্র সংগ্রাহকদের নিকট প্রসিদ্ধ। এই চিত্রকর্মগুলো সেই সময়ের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়, যে সময় পারসিয়ান, মোগল ও ওসমানি শাসকগণ পারস্য এবং ভারতবর্ষে তাদের ক্ষমতাকে প্রসার করেন। দৃশ্যত ছোট-ছোট চিত্রাবলীকে বই আকারে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পকর্মটি বিভিন্ন চিত্রাবলীকে উপস্হাপনের মাধ্যমে কোন এক সময়ের ঐতিহাসিক সময়কালকে স্বরণ করিয়ে দেয়। গভীর আগ্রহ এবং পরিকল্পনার সমন্বয়ে এটি একটি কালের ধারাবিবরণী যা আকর্ষণ করে গবেষক ব্যাতীত ব্যাপক শিল্পরসিক ও সংগ্রাহকদের।

সংগ্রহের এই পদ্ধতিটি উচ্চ শিল্প মূল্য এবং শাসকশ্রেণী ও অভিজাতবর্গের সামাজিক আভিজাত্যকে বাড়িয়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

*'মুরাক্কা'*র একটি সংগ্রহ তৈরী হতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হতো। পৃষ্ঠা হতে পৃষ্ঠা এমনকি লিপিবিদরা পুরাতন কোন পুস্তক হতে অনুলিপি তৈরী করে তাদের কর্ম সম্পাদন করতেন। যদিও এ সমস্ত চিত্র উপস্থাপন ও রচনা করা হত প্রাথমিক অবস্থায় শাহ এবং সম্রাটদের জন্য। ইতিহাসের সর্বপ্রথম *'মুরাক্কা'*টি কয়েকটি লিখন বিদ্যার দ্বারা তৈরী হয়েছিল। এই *'মুরাক্কা'*টি হিরাতে তৈমুরীয় রাজপুত্র বায়সানগুরের রাজদরবারে ছিল। পনের শতক হতে এই ক্ষুদ্র চিত্রশিল্প ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করতে থাকে। পারস্যবাসীদের নিকট *'মুরাক্কা'*র অর্থ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চিত্রশিল্পের text ব্যতিরেকে একসাথে সমাহার।

এই *'মুরাক্কা'*গুলো বিভিন্ন আকৃতিতে সাজানো হত এবং উৎকৃষ্ট পৃষ্ঠায় আকৃতি দেয়া হত। মাঝে-মাঝে চিত্রের চতুর্পাশে উন্নত কারুকাজ করা হত যাকে 'হাশিয়া' অর্থাৎ প্রান্তিক নক্সা বলা হয়। এই কাজের সংকলন শেষ হলে খুবই বিলাসী সুসজ্জিত স্বর্ণের ষ্টাম্পিং করা হত চামড়ার উপর। কখনও-কখনও কতিপয় লিখন বিদ্যার সাথে এমন চিত্র প্রদর্শন করা হত যাতে সংকলকের সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। প্রস্তুতকৃত *'মুরাক্কা'*র লিখনবিদ্যা (লিপিকলা) ধারাবাহিকভাবে লিখন শৈলীর অগ্রগামিতা অনুমিত হয়।

বড়-বড় *'মুরাক্কা'*গুলোতে বিশেষ ভাবে ভূমিকা লিপিবদ্ধ থাকত। এই অংশে চিত্রকর ও হস্তলিপিবিদদের জীবনী সংযোজিত থাকত। এখানে অনেক চিত্রকর *'মুরাক্কা'* তৈরী যে তাদের জীবিকার মাধ্যম তা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। এ্যালবামের পৃষ্ঠাসমূহ চিত্রকর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিত। তৈরী *'মুরাক্কা'*গুলো (এ্যালবাম) বিভিন্ন দরবারে উপঢৌকন হিসেবে পাঠান হত। যে সময়ে ক্লাসিক্যাল ইসলামি পান্ডুলিপির ঐতিহ্য শক্তিশালী বর্ণনার উপাদান নিয়ে পূর্ণ বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে যেমন, 'শাহনামা' এবং নিজামীর 'খামসা' ঠিক তখনই *'মুরাক্কা'* শিল্প বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করে।

মধ্য যুগে পারস্যে ক্ষুদ্র চিত্রশিল্পের জয়জয়কার ছিল। আর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সুলতান নিজেই অথবা হিরাত রাজদরবারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যেমন পনের শতকে বায়সানগুর একজন গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবার বুখারা কেন্দ্রের শাসক ছিলেন সেখানকার পৃষ্ঠপোষক। ষোল শতকে সাফাবিদ রাজবংশ পারসিয়ান শাসনের কেন্দ্রীভূত ছিল। সেখানে শাহ এর রাজকর্মচারীগণ কিছু গুরূত্বপূর্ণ বই এর মধ্যে এই বৈচিত্রপূর্ণ শিল্পের ব্যাবহার করেন। উল্লেখ্য ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে শাহ তাহমাসপ

প্রথম এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন যদিও তিনি পূর্বে এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । কিছুকাল পর শাহ তাহমাসপ এর ভ্রাতুষপুত্র ইব্রাহীম মীর্জা মাশহাদে এই শিল্পের পুন প্রতিষ্ঠা করেন । সেখানে পিরজামী ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে এই শিল্পের পৃষ্টপোষকতা শুরু করেন । ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পিরজামীর মৃত্যুর পর শাহ ইসমাঈল দ্বিতীয় এর কর্তৃত্ব গ্রহন করেন । কিন্তু শাহ ইসমাঈলের শাসনকাল ছিল নাতিদীর্ঘ । পরবর্তিতে ধারাবাহিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় । এই সময় ক্ষুদ্রাকৃতি (miniature) চিত্রশিল্প এ্যালবামে স্হান পায় যা আগের জৌলুসপূর্ণ শিল্পের ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলে।

পারসিয়ান *মুরাক্কা'* বা এ্যালবামকে খ্যাতির চূড়ায় নিয়ে যান রেজা আব্বাসী । তিনি ১৫৮০-১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শিল্পে সক্রিয় ছিলেন । তিনি অবশ্য *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবামকে ব্যাবহার করতেন বর্ণনার মাধ্যম হিসেবে । কিন্তু সেখানে প্রকৃত বর্ণনার অভাব ছিল ।

১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তাম্বুল থেকেই ওসমানীয় শাসকগণ ইসলামিক চিত্রকলাতে গুরুত্বের সাথে মনোনিবেশ করেন । গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্টপোষক হিসেবে সুলতান নিজেই কাজ করতেন । রাজ গ্রন্হাগার বিশেষ করে তোপকাপি প্রাসাদ পারসিয়ান পান্ডুলিপি দ্বারা খুবই সমৃদ্ধ ছিল । বিশেষত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অভিযানের সময় পূর্ব পারস্য হতে পান্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয় । পরবর্তিতে ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দের কুটনৈতিক চুক্তির ফলে অনেকগুলো পান্ডুলিপি উপহার হিসেবে আসে । অনেক বড় পান্ডুলিপিকে ভেঙ্গে ফেলা হয় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র এ্যালবাম তৈরীর জন্য । ওসমানী ঐতিহ্যের শুরুর দিকে পারস্য থেকে শিল্পীদেরকে আনা হয় । বিশেষ করে ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে ষোল জন শিল্পীকে তাব্রিজ বিজয়ের পর ফিরিয়ে আনা হয় । যদিও ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রাসাদের রেকর্ডের উপর নয় জনের নাম পাওয়া যায় । সেখানে তুর্কি শিল্পীদের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ জন ।

উল্লেখ্য, ষোল শতক হতেই প্রকৃত ওসমানী শিল্পের প্রকাশ ঘটে মিনিয়েচার (miniature) শিল্পে । তাদের শিল্পে স্হান পায় ভূচিত্রাবলী, সমুদ্র ও জাহাজের ছবি, পরিপাটি সেনা ছাউনির, দূরবর্তী শহরের এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মুখাবয়াবের চিত্র । তাদের চিত্রে শক্তিশালী ইউরোপীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বিশেষত ভ্যেনিসের (Venice) । *'তূর্কি মুরাক্কা'* পারস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রাবলীকেও অন্তর্ভূক্ত করে । যেমন কলমে আঁকা, বর্ণনামূলক চিত্র, পত্র-পল্লবের বৈচিত্র, পাখি অথবা প্রাণির চিত্র ইত্যাদি । *'মুরাক্কা'* সমূহ উৎসর্গ করা হত সুলতানদের নামে প্রতিকৃতি এবং প্রশংসামুলক বাণীর মাধ্যমে । এটিও তূর্কি এ্যালবামের আরও একটি বৈশিষ্ট্য বটে । তুর্কি এ্যালবামে তুর্কি জাতির ইতিহাস ও জীবনাচারণের দৃশ্যও স্হান পেত । যেমন একক পোশাক পরিধান পদ্ধতি এবং সমাজের বিভিন্ন

শ্রেণীর নির্যাতন পদ্ধতি ও প্রাণ সংহার পদ্ধতি । তূর্কিরা এ্যালবামে এমন কিছু চিত্র আঁকত যা সমসাময়িক ইউরোপে প্রচলিত ছিল । অটোমান এ্যালবামে আরো একটি বিশেষ ক্ষুদ্র চিত্র স্থান পেয়েছিল তা পারস্য থেকে আমদানী করা 'বুটিক' । সেখানে আরও বিশেষ কিছু রহস্যজনক চিত্র স্থান পেয়েছিল যা 'সিয়াহি কলম' বা 'ব্লাক পেন' । জল্লাদের জীবন সম্বলিত চিত্র যা মধ্য এশিয়ার যাযাবর জীবনকে ঈঙ্গীত করে । এই চিত্রটি পনের শতকে পারস্যে এবং ষোল শতকে তুরস্কে দেখা গিয়েছিল । তুর্কি চিত্রশিল্পে আরও একটি বিশেষ ধরণের চিত্র পাওয়া গিয়েছিল তা হোল টুকরা কাগজের চিত্র- যেখানে বিভিন্ন রঙিন কাগজ টুকরা-টুকরা করে একসাথে এটে দেওয়া হত । এই কৌশলটি তৈমুরীদ পারস্যে বই এর কভারে ব্যাবহার করা হত, ফলে বই নষ্টের হাত থেকে রক্ষা পেত। আর তুরস্কে এই পদ্ধতি এ্যালবামের ভিতরে স্থান পেত এবং পৃষ্ঠার চতুর্দিকে সজ্জার কাজেও আসত।

১৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন যখন পারস্যের শিল্পী মীর সায়িদ আলী ও খাজা আব্দুস সামাদকে নিয়ে ভারতবর্ষে ফেরত আসেন তখন মোগল রাজবংশের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে চিত্রশিল্পের যাত্রা শুরু করেন । কিন্তু মোগল চিত্রশিল্প পরিপূর্ণতা লাভ করে বাদশাহ আকবরের সময় । আকবরের শিল্পীগণ বিভিন্ন পুঁথী ছাড়াও একক ক্ষুদ্র *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবাম রচনা করেন । শুরু থেকে মোগল চিত্ররীতি প্রকৃত ক্ষুদ্র চিত্ররীতির বৈশিষ্ট্য বহন করে । সম্ভবত পশ্চিমা চিত্ররীতি দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিল যা মোগল রাজদরবারে অহরহ পাওয়া যেত । দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পুরুষ ও মহিলা রাজকর্মচারিদের চিত্র আঁকা হোত । যদিও এই সময় উচ্চ মর্যাদাশীল মহিলার চিত্র প্রদর্শিত হয়নি । আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মোগল রীতিতে প্রাণি ও গাছপালার চিত্র বেশী অংকন করা হত বিশেষত ফুল । চিত্রকর রিজা আব্বাসীর চিত্রসমূহ প্রথমে কম জনপ্রিয় থাকলেও পরে প্রাসাদে তাঁর চিত্র স্থান পাওয়ায় পরবর্তিতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । বিশেষত মুসলমান ও হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট এর কদর বহুলাংশে বেড়ে যায় ।

বাদশাহ আকবরের একটি *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবাম ছিল যা বর্তমানে স্মৃতির অতল গহবরে । যেখানে তাঁর অসংখ্য রাজদরবারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বলিত ছবি ছিল । কালানুক্রমিক হিসেবে তিনি এ সমস্ত ছবি সমূহ সংগ্রহ করেছিলেন । যেমন একটি চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ নিয়োগের সময় পরামর্শ সভা । বাদশাহ আকবরের অনেকগুলো ছবি ছিল বেশ মার্জিত ভাবে অংকিত । ভারতীয় ক্ষুদ্র চিত্রণ শিল্পে আকবরের যোগ্য উত্তরসূরী জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান এর নিকট এই প্রতিকৃতি অংকণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যা পরবর্তিতে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের নিকট ছড়িয়ে পড়ে । আঠার ও উনিশ শতকে কিছু ভারতীয় চিত্রকরগণ ইন্দো-ইউরোপিয় কোম্পানির

রীতিতে চিত্রাংকণ করত । কোনটিতে ইউরোপিয়গণ ভারতে বসবাস করা বৃটিশ রাজ এর অংশ, কোনটিতে ফ্রান্স এবং পর্তুগিজদের সমান পদচারণা পরিলক্ষিত হয় । এর মধ্যে কিছু কিছু ইউরোপিয় ভারতীয় ক্ষুদ্র চিত্র সংগ্রহ করত অথবা তাদের নিকট প্রেরিত হত । লর্ড ক্লাইভ (Lord Claive) এর নিকট লার্জ ক্লাইভ এ্যালবাম (Large Clive Album) অথবা স্মল ক্লাইভ এ্যালবাম (Small Clive Album) নামে অনেক চিত্রের সংগ্রহ যা বর্তমানে লন্ডনে ভিক্টোরিয়া এন্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়াম (Victoria & Albert Museum) এ সংরক্ষিত আছে । আরও কতিপয় এ্যালবাম রয়েছে নিউইয়র্কে । এখানে সকল ক্ষুদ্র চিত্রে প্রাণীর প্রতিকৃতি, ঘোড়া, বাসস্থান এবং মূল্যবান জিনিষের ছবি পাওয়া যায়।

উনিশ শতকে অংকিত ভারতীয় চিত্রে আঞ্চলিক এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের রুপ পরিগ্রহ হয় । যেমন পেশাগত চিত্রও ফুটে ওঠে । সে সময় কর্নেল জেমস স্কিনার বহুলাংশে এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন । কর্নেল জেমস এর একজন রাজপুত মা ছিলেন । যিনি প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বলিত চিত্র অংকন করতেন । এলিজা ইমপে এর স্ত্রী মেরী ইমপে যিনি তিনশত ক্ষুদ্র চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন । প্রথম ডিউক অব ওয়েলিংটনের ভ্রাতা মার্কস ওয়েলেসলি প্রায় পচিশ'শ চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ।

জীবণের কোন ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবামকে উপহার হিসেবে ব্যাবহার করা হত । *'মুরাক্কা'*র মাধ্যমে কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ থাকত । যেমন ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহ তাহমসপ প্রথম এর নির্দেশে পারস্য রাজপুত্র ইব্রাহীম মির্জা নিহত হলে তার স্ত্রী স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবামগুলো ধ্বংস করে ফেলেন । কোন শাসকের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে *'মুরাক্কা'* প্রস্তুত করে উপহার দেয়া হত । তুরস্কের নববর্ষের অনুষ্ঠানে *'মুরাক্কা'* উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হত । ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান তৃতীয় মুরাদের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষ্যে একটি অসাধারণ *'মুরাক্কা'* তৈরী করা হয় । *'মুরাক্কা'*টিতে স্থান, তারিখ ইত্যাদি খচিত রয়েছে । উদাহরণ স্বরুপ ইস্তাম্বুল (Istambul), 980, A/H/1572-1573 খ্রিষ্টাব্দ) এই *'মুরাক্কা'*টি উৎসর্গ করেছিলেন সুলতান তৃতীয় মুরাদের জন্য । এটি তৈরী করেন মেহমুদ কেডরিসাইজেড (Mehmed Cederecizade) । তৃতীয় মুরাদের জন্য তৈরী *'মুরাক্কা'*টি অন্যান্য *'মুরাক্কা'*র তুলনায় অত্যন্ত ব্যায়বহুল ছিল । এর চতুর্পাশের চিত্রকর্মে মৌলিক 'হাশিয়া' (Hashiya / Nakkashane) ব্যাবহার হয় । চব্বিশটি চিত্র সম্বলিত *'মুরাক্কা'*টি বুখারা, তাব্রিজ, ইস্পাহান এবং পারস্যের কাযভিন (Kazvin) শহরে তৈরী যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রকর্ম, কালিতে আঁকা চিত্র সমূহ এবং গজল সহ চিত্রলিপি দ্বারা সুশোভিত । এই *'মুরাক্কা'*র শুরুতে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা রয়েছে যা তৈমুরীয় ও সাফাবিদ এ্যালবামের গঠনের

সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ । উল্লেখ্য, এই *'মুরাক্কা'* টিতে একটি ঈঙ্গীত থাকে যে, মুরাদ সুলতান হওয়ার দুই বছরের কম সময়ের পূর্বেই এটি ইস্তাম্বুলে তৈরী করা হয় । ওসমানী রাজবংশের সংগ্রহে আরো একটি *'মুরাক্কা'* রয়েছে যা পশ্চিমা এ্যালবামের সাথে সামন্জস্যপূর্ণ । পনের শতকের শেষের দিকে ফ্লোরেন্টাইন (Florentine) শিরোনামে একটি *'মুরাক্কা'* এ্যালবাম পনেরটি চিত্র সম্বলিত প্রকাশিত হয় যেখানে ধর্মীয় বিষয়বস্তু অগ্রাধিকার পেয়েছিল । বস্তুত ফ্লোরেন্টাইন এ্যালবামের মাধ্যমে পশ্চিমা ছাপ কিছুটা জীবন্ত হয়ে ওঠে । দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এই সমুদয় কার্যাবলী সংগ্রাহক কর্তৃক অধিকাংশ কর্মকান্ড ধ্বংস করা হয় ।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যে *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবামটি তৈরী করা হয় তা হল সেলিম এ্যালবাম (The Salim Album) । বড় কেশু এর চিত্রকর, মোগল বাদশাহ আকবরের সময় এটি প্রস্তুত করা হয় । এতে খ্রিষ্টিয় চিত্র ও হিন্দুদের প্রতিকৃতির সমন্বয় ঘটানো হয় । অন্য একটি *'মুরাক্কা'* মিন্টো এ্যালবাম (The Minto Album) বাদশাহ শাহজাহানের সময় তৈরী করা হয় । এখানে রাজদরবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র, বাগান এবং বন্য প্রাণীর দৃশ্য পাওয়া যায়, যার চতুর্দিকে হাশিয়ার সহযোগে বিস্তৃতভাবে ফুলের চিত্র রয়েছে । আরো একটি *'মুরাক্কা'* হল শাহজাহান এ্যালবাম (The Sahjahan Album) । বিখ্যাত এই এ্যালবামটি ইউরোপীয় ব্যাবসায়ী 'ডিমোট' টুকরো টুকরো করে বিনষ্ট করে ফেলেন ।

বিংশ শতাব্দীতে আব্দুর রহমান চুঘতাই নামক একজন চিত্রকর *'মুরাক্কা ১ চুঘতাই'* প্রকাশের মাধ্যমে পাকিস্তানে *'মুরাক্কা'*কে পুনর্জীবিত করেন । ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন *'মুরাক্কা'*টি তৈরী শুরু করেন তখন তিনি হিন্দু পৌরানিক কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন । এরপর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইসলামি চিত্রকর্ম এবং ওসমানীয় মিনিয়েচার (miniature) চিত্র দ্বারা প্রভাবিত হন ।

একবিংশ শতাব্দীতে সুমাথী রামাস্বামী ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ ফাউন্ডেশন (Digital Humanities Foundation) এর মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যাবহার করে মোগল চিত্রকলাকে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভাবে উপস্থাপন করেন এবং বিশ্ব পরিমন্ডলে আধুনিক ভারতের চিত্রাবলী তুলে ধরেন ।

তথ্যসূত্র

১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৯, পৃ. ৪৫

২. T. W. Arnold, *Painting in Islam* (First published, Oxford, 1928), New ed., New York, Dover Publicatins, 1965, p. 19

৩. Viollet. H, *Sammarra*, Encyclopeadia of Islam, vol. iv, 1934, p. 132-133

৪. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬২

৫. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২০

৬. Barret, *Persian Miniature Painting,* London, Faber Gallery of Art, 1963, p. 4

৭. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪৮-১৪৯

৮. এ. বি. এম. হোসেন, *ইসলামী চিত্রকলা,* খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০০৪, পৃ. ৯২

৯. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯২

১০. *Ibid,* p. 10

১১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৪

১২. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২১৩

১৩. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩৫

১৪. T. W. Arnold, *op. cit.,* p. 34-37

১৫. Babur, *Babur-Nama,* tr., by Henry Beveridge, Delhi, Low Price Publications, 2012, p. 291

তৃতীয় অধ্যায়

মুরাক্কার ভারতীয় সূত্রপাত

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলিম শাসনের তাৎপর্য এক সুদূর প্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। হিমালয়, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের আশির্বাদপুষ্ট এই বিস্তীর্ন এলাকা প্রাচীন কাল হতেই বহু দিগ্বিজয়ী বীর ও পরাক্রমশালী শাসকগণের বিচরণ ভূমি ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি রাজন্যবর্গের আমল ছাড়া অন্যান্য সময় ভারত তার অখন্ডতা ধরে রাখতে পারেনি। কালক্রমে দূর্বল হয়ে পড়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গ। এরই মধ্যে আরব ও তুর্কিগণ এ দেশে তাদের অবস্থান করে নেয়ার প্রয়াস পায়। ভারতের এই রাজনৈতিক অবস্থাকে ষোড়শ শতকের জার্মানীর সাথে তুলনা করা যায়।

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকগণের শিল্প- সংস্কৃতির চর্চা ও বিস্তারন এর সূত্রপাত হয় সালতানাত যুগ হতে। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে কথিত দাস বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দিল্লীতে সালতানাত যুগের অভ্যুদয় ঘটে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সালতানাত পূর্ব যুগে ভারতবর্ষে আরও একজন বিখ্যাত বিজেতা সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। তবে প্রাক-সালতানাত যুগে সুলতান মাহমুদের মত শিল্প সংস্কৃতির সমঝদার মুসলিম শাসক তেমন একটা মেলেনা। একাধারে দিগ্বিজয়ী বীর হিসেবে তাঁর যেমন প্রসিদ্ধি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিল্প-সাহিত্যের প্রতিও তিনি ছিলেন ভীষণ অনুরক্ত। কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মশাস্ত্রবিদ প্রভৃতি বিদ্যানদের দ্বারা তদানিন্তন গজনী এশিয়ার শিল্প সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর রাজসভায় আবু রায়হান আল-বেরুনী, আল-ফারাবী, ফেরদৌসী, মিনুচেহরী ও উৎবীর মত বিখ্যাত পন্ডিতগণ দ্বারা আলোকিত ছিল। তথাপি চিত্রকলার প্রতি এই শাসকের আগ্রহ বা কর্মকান্ডের কোন উদাহরণ ইতিহাসে নেই। মুসলিম শাসকদের মধ্যে ৮ম শতকের গোড়ার দিকে আসা মুহম্মদ বিন কাসিম সম্পর্কে অশোক মিত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে- 'তাঁর অনুচরদের একজনের লেখায় জানা যায়, একদল হিন্দু শিল্পী কাশিমের কাছে তাঁর আর তাঁর সেনাপতিদের ছবি আঁকার প্রস্তাব করেন'।[১] এতেই বোঝা যায়- তখনকার দিনেও ভালো ছবি (portrait) আঁকা হত । অবশ্য এর পরবর্তি ইতিহাস আমাদের অজানা রয়ে গেছে।

৩.১ বুদ্ধের জন্ম, খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতক, পাল চিত্র, বাঙলাপিডিয়া

ভারতীয় চিত্রকলার অন্য একটি অনবদ্য আকর্ষনীয় অংশ হচ্ছে পুঁথিচিত্র। পুঁথিচিত্রের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হোল পাল (ছবি নং-৩.১) ও জৈন

পুঁথিচিত্র। পাল আমলে (৮-১২ শতক) মার্গীয় রীতির আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় তালপাতায় লিখিত ও চিত্রায়িত পান্ডুলিপিগুলো পাল পুঁথিচিত্রের নিদর্শন হিসেবে সমসাময়িক ও আধুনিককালের শিল্প রসিকদের নিকট ব্যাপকতর ঐতিহাসিক গুরুত্বে পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক এস, কে সরস্বতীর উক্তি হচ্ছে 'ভারতের পৌরানিক ধর্মের পূর্ণ বিকাশকালে পাল পুঁথিচিত্র গুপ্তযুগের মার্গচিত্ররীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে এবং খ্রিষ্টিয় নবম হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষতা লাভ করে'।[২]

আমরা জানি, যে কোন মহৎ প্রভাবের সুফল সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তার ক্ষয় হতেও সময় লাগে। মধ্যযুগের এই সকল পুঁথিচিত্রের বেলায়ও সেটি বহুলাংশে প্রযোজ্য। চিত্রকলার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ যেমন পবিত্র আল-কোরআনের পাতাকে ও ধর্মীয় স্থাপত্যকে সজ্জিতকরণের নিমিত্তে এর চর্চা শুরু হয় তেমনিভাবে অধিকাংশ পুঁথিই বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থের অনুলিপিকে ঘিরেই সূত্রপাত হয়। প্রকৃত অর্থে এই সময়কার চিত্রকলার ধরণ ও প্রকৃতির সাথে মোগল চিত্রকলার কলাকৌশল কোন ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাবিত হয়েছিল তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঐতিহ্যের উত্তরাধীকার। যেহেতু মুসলিম চিত্রকলার বিকাশে নিরেট ভারতীয় রীতি কৌশলের প্রভাব অনস্বিকার্য সেহেতু মধ্যযুগের এই চিত্রকলা মোগলদের স্থানীয় শিল্পীদের হাতে আরব-পারস্য শিল্প কৌশলকে কিভাবে ও কোন দিকে প্রভাবিত করেছিল তার খুটিনাটি টেকনিকগুলোকে উল্লেখ করাই যায়। তবে তা আলোচ্য বিষয়ের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছিল কেবল সেই অংশটিই আমাদের অনুসন্ধানের ও গবেষণার ক্ষেত্র। একই ভাবে পুঁথিচিত্রের অন্য একটি শক্তিশালী ঘারানা জৈন পুঁথিচিত্র। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- পঞ্চম শতকে গুজরাটে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং জৈন পুঁথিচিত্রের সংরক্ষণ হুমকির মধ্যে পড়ে। সেই সময় জৈন বণিক ও ধনীব্যক্তিরা এই অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ সংরক্ষণে এগিয়ে এলে সম্পদগুলো রক্ষা পায়। কথিত আছে রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ ও কুমারপালের রাজত্বের সময়ে (দ্বাদশ শতক) সমগ্র ভারতে একুশটি জ্ঞান ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাত'শরও অধিক পুঁথিলেখককে নিযুক্ত করেন।[৩] তাঁদের সময় পুঁথিগুলো সোনার

আল কোরআনের একটি পাতা, JPEG সংগ্রহ, একাদশ শতক

কালিতে লেখা হত। সুতরাং ভারতবর্ষে চিত্রকলায় মুসলিমদের চর্চার ক্ষেত্র ও পর্যবেক্ষণের অধ্যায়গুলো সত্যই বৈচিত্রময়তায় ভরপুর। এটা অবশ্য শক্তিশালী শিল্পরীতি গড়ে ওঠার পূর্ব শর্তও বলা যেতে পারে।

৩.২. নিমতনামা, সুলতান নাসির উদ্দিন শাহ, Wikipedia, ত্রায়োদশ শতক

ভারতে তিনশত কুড়ি বছরের সালতানাত (১২০৬-১৫২৬ খ্রি:) শাসনামলে মুসলিম শিল্প-সংস্কৃতির প্রকৃত চর্চার সূত্রপাত হয়। তবে মোগলদের মত স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাদের আধুনিকতার চৈতন্য লক্ষ্যনীয় হোলেও চিত্রকলায় সেই পথ সংকুচিত ছিল। এই অন্তরার একটি বিশ্লেষণ অবশ্য ইসলামি শিল্পকলার সমালোচক এ.বি.এম হোসেন দিয়েছেন। তিনি প্রথমত সুলতানি যুগে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও দ্বিতীয়ত তৈমুর লং এর রাজধানী দিল্লীর ধ্বংস সাধন কারণ দ্বয়কে চিত্রকলার বিকাশের অন্তরায় বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু ত্রায়োদশ ও চতুর্দশ শতকে সুলতানগণ মোঙ্গল আক্রমণ ও রাজপ্রাসাদ এবং সীমান্ত রক্ষায় বেশী মনোযোগি ছিলেন। সুলতানি শাসনামলে 'নিমতনামা' (ছবি নং ৩.২) ও 'লৌরচন্দ্রার' আবিষ্কার অধিকতর উল্লেখযোগ্য হোলেও সবচেয়ে পুরানো পান্ডুলিপির চিত্রয়ানে লৌর চন্দ্রের প্রেম উপাখ্যান 'চন্দায়ণ' (১৩৮৯ খ্রি:) এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ক্যাম্ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রক্ষিত মৈথিলী ভাষায় রচিত 'কালচক্রতন্ত্র' ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ 'ভগবত পুরাণ' ইত্যাদি পান্ডুলিপি সুলতানি শাসকদের অমর কীর্তি। বস্তুত সুলতানি আমলের পান্ডুলিপি গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন শিল্পবোদ্ধাগণ। প্রথমত ভারতীয় রীতিতে তৈরী, দ্বিতীয়ত ভারতীয় এবং মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যের সংমিশ্রণে নির্মিত এবং তৃতীয়ত অপরিপক্ক পারসিক রীতিতে অঙ্কিত পান্ডুলিপি।[৪] প্রসঙ্গত সুলতানি শাসনামলে যথারীতি পবিত্র আল-কোরআন কে সজ্জিতকরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ণ প্রকরণ হিসেবে 'কুফী' ও 'সুলস' এর ব্যবহার ছিল অধিকতর।

সুলতানি আমলে মালওয়া চিত্রকলা ছিল ভারতীয় ও ফার্সী পান্ডুলিপি চিত্রায়ণের জন্য বিখ্যাত। দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত জৈন 'কল্পসূত্রের' কপি ও ম্যানচেষ্টারের জন রাইল্যান্ডস ইউনিভার্সিটিতে

রক্ষিত ‘চন্দায়ণ’ এ (ছবি নং ৩.৩) চিত্রিত কপি এইক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইখানে একটি তথ্য লক্ষ্যনীয় যে ম্যানচেষ্টারের ‘চন্দায়নের’ কপিতে মোট ২৮৫ টি চিত্র ছিল যা প্রকৃত অর্থেই ছবির বই/এ্যালবাম (*মুরাক্কা*)। এর সবগুলো ছবি ভাঁজ পৃষ্ঠায় এবং উল্টো পৃষ্ঠায় টেক্সট। অর্থাৎ এর এক পাতায় ছবি আর অন্য পাতায় ছবির বর্ণণা । ছবিগুলোর অংকন রীতি ও চরিত্রে পারসিক চিত্ররীতির সিরাজ স্কুলের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্যনীয়। এই সময় ১৫০২-০৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দীনের জন্য ‘বুস্তানের’ (ছবি নং ৩.৪) পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছিল যাতে পারস্যের সিরাজের পরিবর্তে হিরাতের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, যেহেতু পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে পারস্য চিত্রকলার চিত্রকর যুগের বিস্ময় ‘কামাল-উদ্দীন বিহযাদ’ হিরাতে শিল্পচর্চা করছিলেন হয়তবা তাঁর শিষ্যদের মধ্য হতে অনুল্লেখ্য কোন চিত্রকর মান্ডুতে এসে পান্ডুলিপি চিত্রায়নে অংশ নেন। সুলতানি আমলে অপরাপর দক্ষিণী (Deccani) চিত্রপীঠ বিজাপুর, আহমেদনগর, বিদার ও গোলকুন্ডায় যে সকল চিত্রকর্ম সম্পন্ন হয় তাতেও তৈমুরী ও সাফাভি চিত্রকলার চরিত্র ফুটে ওঠে। সে কারণে মোগল চিত্রকলার উন্মেষে উত্তর ভারতের সুলতানি চিত্রকলার প্রভাব ছিল বলে শিল্প সমালোচক প্রফেসর ড. নাজমা বেগম তাঁর ‘উত্তর ভারতে সুলতানি চিত্রকলা : একটি সমীক্ষা’ প্রবন্ধে স্পষ্টতই ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং পারস্য চিত্রকলার ভারতবর্ষে চর্চা মোগলদের সময়ই শুরু হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তটি বোধ করি নতুন করে ভাববার প্রয়াস আছে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে।

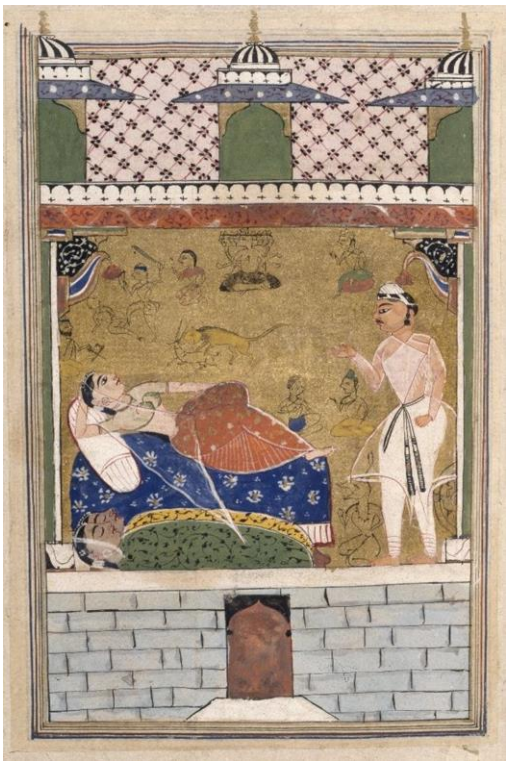

৩.৩ লৌরচন্দায়ন এর চিত্র, **জন** রাইল্যান্ড লাইব্রেরি, ১৩৭৭-৭৮ খ্রি:

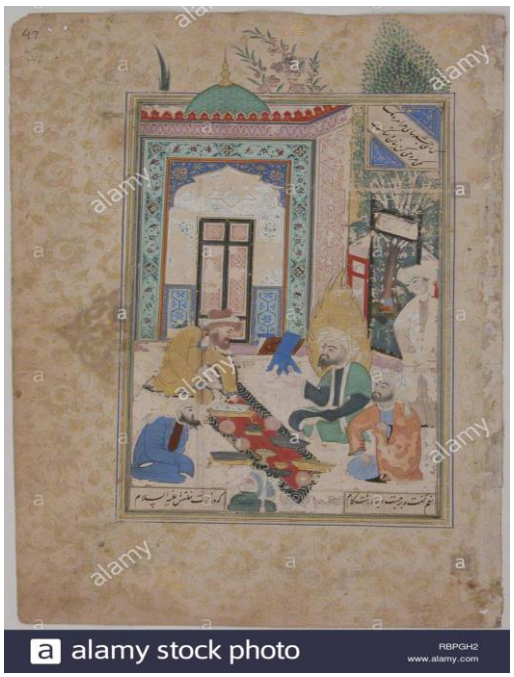

৩.৪ সাদির বুস্তান, নাসির উদ্দিন, এ্যালামি কালেকশান, লন্ডন, ১৫০৩ খ্রি:

১৩৩৮ খ্রি: ফখর উদ্দিন মোবারক শাহ দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা হতে পূর্ব বাঙলাকে স্বাধীন ঘোষনা করেন । ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রি: বাঙলা পরিভ্রমন করেন এবং তাঁর বর্ননাতে ফখর উদ্দিন ও তাঁর রাজধানী সোনারগাঁয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন । এর পর হাজী ইলিয়াস শাহ শাসন ক্ষমতায় আসেন । তাদের বংশীয় শাসন ব্যবস্থা ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এই সকল স্বাধীন শাসকদের শাসনামলে বাঙলার স্থাপত্য, সাহিত্য ও চিত্র শিল্প প্রভুত উন্নতি সাধন করে । তবে এখানকার আদ্র জলবায়ুর কারনে এ সকল শিল্পকর্ম অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয় । এর মধ্যে হোসেন শাহী সুলতান নসরত শাহের আমলে রচিত 'শরাফনামা' যা বর্তমানে বৃটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে । পান্ডুলিপিটি ১৫৩১-৩২ খ্রি: আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র নাসির উদ্দিনের পৃষ্টপোষকতায় চিত্রিত হয়েছিল । সুতরাং স্থানীয় শিল্পরীতির একটি উন্নত ধারা বাঙলাতেও বিদ্যমান ছিল ।*

ভারতবর্ষে মোগল চিত্রকলার ইতিহাস মুসলিম সংস্কৃতির এক অনবদ্য ধ্রুপদি শিল্প চর্চা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা জানি 'মোগল' শব্দটি 'মোঙগ' হতে উৎপত্তি যার অর্থ নির্ভীক। ভারতীয় উপমহাদেশে মোগলদের আগমন ও রাজ্য শাসন সেই শাব্দিক অর্থেরই পরিপূর্ণতা বহন করে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পাদ্‌শাহ জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর ছিলেন মধ্য এশিয়ার দূর্ধষ্য দিকজয়ী চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লঙ্গের বংশধর। ১৫২৬ খ্রি: পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশ ১৮৫৮ খ্রি: পর্যন্ত তিনশত বত্রিশ বছরের শাসন ভারতবর্ষকে উপহার দেয়। শাসনামল ও শাসকদের দিক হতে এই তালিকা সুদীর্ঘ হোলেও কাযযর্ত্ মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণোজ্বল শাসনকাল বাদশাহ আওরাঙজেব এর সময় (১৭০৭ খ্রি:) পর্যন্তই স্থায়ী ছিল। ১৮১ বছরের এই সময়কালে মোগল শাসকগণ স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। রাজ্য শাসক হিসেবে তাঁদের গুনপনা সেই ক্ষেত্রে অনেকটা মলীন হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে তাঁরা অভারতীয় থাকলেও এই দেশ মাতৃকার প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ দিয়ে ইতিহাসে অনিবার্যভাবে স্থায়ী জায়গা করে নেয়ার ক্ষেত্রে কেউই আপোষ করেননি। হয়ত সে কারণেই ধর্মকে কিছুটা বিসর্জন দিয়ে গড়ে উঠেছে বাদশাহ আকবরের শাসনতান্ত্রীক ধর্ম 'দ্বিন-এ-ইলাহী' এবং প্রজা সকলের চরম দূর্ভিক্ষের উপর নির্মিত হয়েছে ভালবাসার অমর কীর্তি 'তাজমহল'।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি বাবুর চার বছর শাসনকাল পরিচালনা করেন (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি:)। বহুবিধ প্রতিভাসম্পন্ন বাবুর ইতিহাসে এক অতি আকর্ষণীয় ও কৌতুহল উদ্দীপক চরিত্র। তিনি ছিলেন একাধারে সামরিক যোদ্ধা, কবি ও দার্শনিক। সঙ্গীত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ তাঁকে করেছিল শিল্পসচেতন। বাদশাহ তুর্কী ভাষায় আত্মচরিত 'বাবুরনামা' রচনার মাধ্যমে উদার মনোবৃত্তি,

মার্জিত রুচি ও পর্যবেক্ষণ শক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তাঁর জীবন স্মৃতিতে জীব-জন্তু ও পশু-পাখির প্রতি তাঁর যে অসাধারণ মমোত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে হয়তবা সেই প্রভাবই পরবর্তী উত্তরসুরী বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে গভীরভাবে আপ্লুত করে। বাবুরের রচনা সম্পর্কে বেভারিজ ও স্টেনলি লেনপুল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এতদ্বসত্ত্বেও চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু চিত্রকলার একজন সমঝদার হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র একটি পরিচয় মেলে। বাদশাহ বাবুর প্রায় সমসাময়িক যুগের বিস্ময় 'কামাল-উদ্দিন বিহযাদ'(১৪৪০-১৫২৪ খ্রি:) সম্পর্কে মতামত দেন যে, 'তাঁর শিল্পকর্ম ছিল খুবই উন্নত ধরণের। কিন্তু শ্মশ্রুবিহীন মুখমন্ডল তিনি অঙ্কন করতে পারেননি; তিনি দুভাঁজ বিশিষ্ট থুতনিকে খুবই লম্বা করতেন। শ্মশ্রুযুক্ত মুখমণ্ডল তিনি চমৎকার অঙ্কন করতে পারতেন'।[৫] এই মন্তব্য হতে বোঝা যায় চিত্র ও শিল্পী সম্পর্কে তাঁর ধারণা বাস্তব সম্মত (ছবি নং ৩.৫)। শিল্পকলার প্রতি তাঁর অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গী মেলে আগ্রায় তাঁর বাগান যা 'চাহারবাগ' বলে অভিহিত কয়েকটি প্যাভিলিয়নের বিদ্যমান অবশিষ্টাংশ থেকে যা পারসিক ও ভারতীয় ভাবধারাতে তৈরী হয়েছিল। যেহেতু স্বল্পকালীন সময়ে তিনি রাজ্য শাসন করেন এবং সে সময়ের কোন দেওয়াল চিত্র অথবা পান্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়নি তাই শিল্পকলার সমঝদার হোলেও হয়তবা সময়ের অভাবে বা অন্য কোন সীমাবদ্ধতায় বাবুরের সময় চিত্রকলার চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা হয়নি বলে প্রতিয়মান হয়।

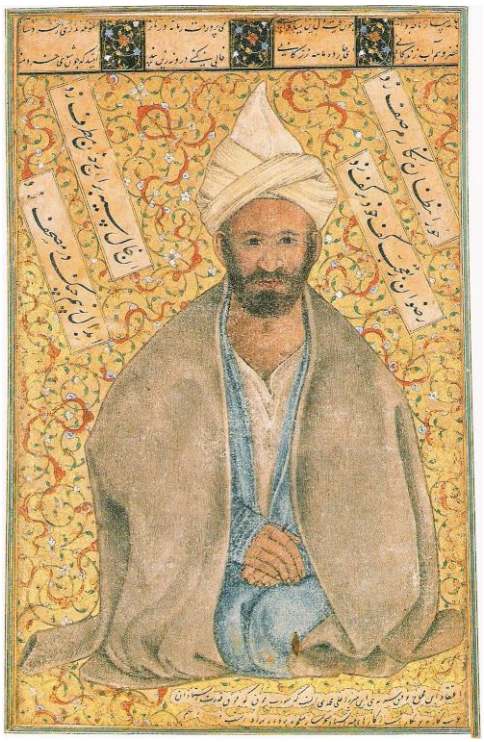

৩.৫ দরবেশের প্রতিকৃতি, বিহযাদ, JPG ও উইকিমিডিয়া কমনস সংগ্রহ, ১৫৪৫ খ্রি:

নাসির উদ্দিন মুহাম্মাদ হুমায়ূন ১৫৩০ খ্রি. মাত্র বাইশ বছর বয়সে উত্তরাধিকার সূত্রে দিল্লীর সিংহাসন আরোহন করেন। পিতা বাদশাহ বাবুরের উৎসাহে তিনি তুর্কি ছাড়াও ফারসি ও আরবি ভাষা রপ্ত করেন এবং দর্শন, গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাথে শাসন সম্পর্কীত বিষয়াদীও শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শাসনামল মূলত দুই ভাগে বিভক্ত, ১৫৩০-৪০ ও ১৫৫৫-৫৬ খ্রি. । ঘটনাক্রমে ১৫৩০ খ্রি: হুমায়ূন বিলগ্রামের যুদ্ধে আফগান নেতা শেরশাহের নিকট পরাজিত হন। পরাজিত বাদশাহ রাজ্য ও গৃহহীন হয়ে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে পরিশেষে স্বপরিবারে পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পারস্যে তখন শাসক ছিলেন সাফাভী সুলতান শাহ তাহ্মাসপ। সুলতান

নিজে ছিলেন চিত্রামোদী। প্রায় ১৫ বৎসরকাল নির্বাসিত জীবনে সাফাভী দরবারে প্রতিথযশা চিত্রকর মীর মুসাব্বির এবং পুত্র মীর সায়িদ আলী তাদের গুণপনার কারণে হতভাগ্য কর্মহীন বাদশাহকে চিত্রকলার প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। বলা হয়ে থাকে ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন শাহ তাহ্মাসপ এর সাহায্যে কাবুলে হুমায়ূন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি মীর মুসাব্বিরকে দরবারে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। বাদশাহ এ যাত্রা সফল হননি। তবে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় যখন শাহ তাহ্মাসপ নিজেই চিত্র শিল্পের প্রতি আগ্রহ হারান। এই অনাগ্রহের কারণ সম্ভবত তূর্কীদের সাথে তার যুদ্ধ ফলে সাফাভী দরবারের শিল্পীগণ রাজকীয় তত্ত্বাবধানের অনীহার অজুহাতে উসমানীয় কোর্ট, প্রাদেশিক শহর মাশহাদ্ ও উজবেগ রাজধানী বোখারাতে পেশাগত অনুসন্ধানে চলে যান। এই সময় কাবুলে অবস্থানরত হমায়ূনের আশ্রয় প্রার্থী হন মীর সায়িদ আলী তাব্রীজী ও সিরাজ হতে আগত প্রখ্যাত চিত্রকর খাজা আবদুস সামাদ। তাব্রীজ ও সিরাজ উৎস হতে আগত প্রখ্যাত এই শিল্পী দ্বয়ের হাতেই মোগল ঘরানার চিত্রশিল্পের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এখানে উল্লেখ করতেই হয় পাদশ্াহ হুমায়ূন তাঁর পিতার ন্যায় বিখ্যাত চিত্রকর বিহযাদের ইহকালীন সাক্ষাৎ পাননি। ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলে নতুন নির্বাসিত শাসকের দরবারে চিত্রশিল্পের নবধারার যাত্রা শুরু হল। ইতোমধ্যে ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কালিঞ্জর দূর্গ অবরোধের ঘটনা শেষ না হোতেই বোমার আঘাতে অর্ধদগ্ধ হয়ে শেরশাহ মৃত্যুবরণ করলে হুমায়ূন তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত এই শাসক যখন মোগল শাসন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণ বিকশিত করার মহাপরিকল্পনায় মগ্ন তখনই পাঠাগারের সিড়ি হতে আকষ্যিক পদস্খলনে এক স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পবোদ্ধার জীবনাবসান হয়।

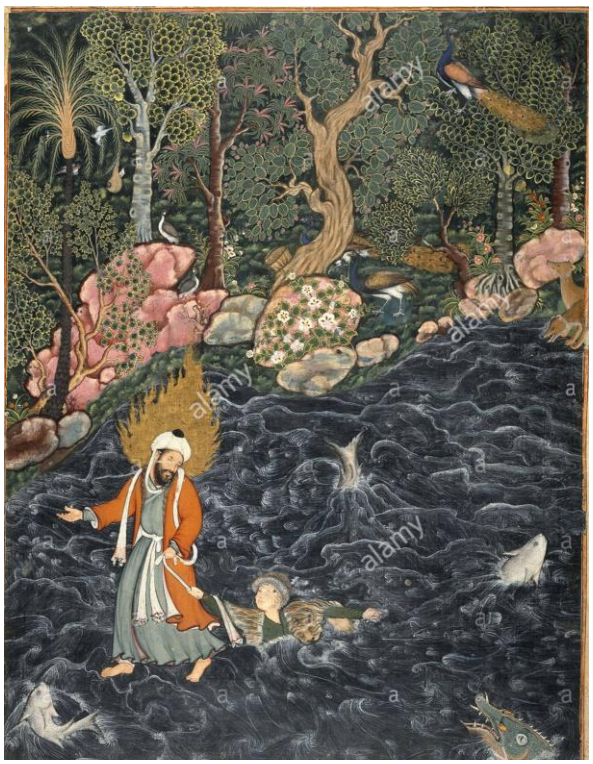

৩.৬ নবী ইলিয়াস ডুবে যাওয়া শাহজাদাকে রক্ষা, মীর সায়িদ আলি, বৃটিশ মিউজিয়াম, ১৫৭৭ খ্রি:

চিত্রশিল্পের প্রতি হুমায়ূনের আকর্ষণের একটি বর্ণনা অশোক মিত্র তাঁর *'ভারতের চিত্রকলা'* (১ম খন্ড) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন 'চিত্রশিল্পের প্রতি পাদ্শাহ হুমায়ূনের এতই দরদ ছিল যে নিজে গরীব অবস্থায় নির্বাসনে থাকলেও সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে উপহারার্থে তিনি মীর সায়িদ আলীকে 'দাস্তাঁ-ই-আমীর হামজা' (ছবি নং ৩.৬) কাব্যের ছবি আঁকার ফরমায়েস দিলেন।[৬] হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর চাচা আমীর হামজার উপর লিখিত এই গ্রন্থটি বারো খন্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি খন্ডে একশ'টি করে ছবি চিত্রায়ন

করা হল। উমরকোটে যখন মহামতি আকবরের জন্ম হয় দূর্ভাগ্যবশত পাদ্‌শাহ হুমায়ূনের স্ত্রী মারা গেলে দাস্তানের প্রথম খন্ডটি তিনি স্ত্রীকে উৎসর্গ করেন। এর ষাটটি চিত্র ভিয়েনা এবং পঁচিশটি ছবি আছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে। ছবিগুলো টেম্পেরায় আঁকা তুলোর কাপড়ের উপর। ছবির সবগুলো হয়ত মীর সায়িদ আলী আঁকেননি, কেননা স্থানীয় শিল্পীরা এরই মধ্যে ঈরানী চিত্ররীতির কলাকৌশল রপ্ত করে তা কিছুটা ভারতীয় ভাবধারাতে প্রকাশের প্রাথমিক পর্ব সূচনা করে ছবি তৈরীতে অংশ নেয়। তবে মোগল আমলের সেই সময়কার চিত্রগুলো সাফাভী বৈশিষ্ট্যের। ছবিগুলোতে প্রতিকৃতি অঙ্কনে পারসিক রীতি অনুসরণ করা হয়। পটভূমিতে গৌণ বস্ত হতে মূখ্য বস্তটি ফুটিয়ে তোলা ও রং-রেখার অভূতপূর্ব বৈচিত্র মোগল চিত্রকরদের মুন্সিয়ানাতে নতুন মাত্রা যোগ করে। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত জীর্ণ কাপড়ের উপর অঙ্কিত হুমায়ূনসহ তৈমুরের বংশধরদের যে ছবি তা সম্ভবত কাবুলে তাঁর তাবুতে আঁকা কপি ও লন্ডনের বেডফোর্ড মহিলা কলেজের হেরিংহাম সংগ্রহে শিকারের দৃশ্য সবই মীর সায়িদ আলীর কর্মের স্বাক্ষর বহন করে।

হুমায়ূনের হাত ধরে ভারতীয় মোগল চিত্রকলার যে সূচনা হয় তা কেবল মাত্র 'দাস্তানে আমীর হামজা' মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইসময় পান্ডুলিপি ভিত্তিক এই চিত্রায়ন ব্যতীত তেমন কোন কাজ লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং মোগল *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবামের যে প্রচলন তা হুমায়ূনের চিত্রশালায় জন্ম লাভ করেনি। তবে অবশ্যাম্ভাবী ভাবে বলা যায়- যেহেতু পারস্য চিত্ররীতির সাফাভী স্কুলের অনুকরণে *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবামের প্রচলন সেহেতু সাফাভী দরবারের এই দুইজন চিত্রকরদের মাধ্যমেই এই রীতি মোগল চিত্রশিল্পে সংযোজিত হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

পিতার মৃত্যুর পর পাদ্‌শাহ আকবর মাত্র তেরো বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তাঁর পঞ্চাশ বৎসরের শাসনকাল (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রশংসার দাবিদার। তিনি উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রক্ষ্মপুত্র নদ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। সম্ভবত কোন ভবিষ্যত দ্রষ্টা কল্পনাও করতে পারেননি যে, রাজ্যহারা-গৃহহারা পলাতক পিতার চরম দুর্দিনে জন্মনেয়া অসহায় শিশুটি মধ্যযুগীয় ইতিহাসে ব্যাপক অংশ জুড়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আকবরের রাজত্বকালের প্রাথমিক সময়কার চিত্রায়নের উদাহরণ তেমন একটা নেই। কেননা, সিংহাসনে বসেই তিনি আগ্রাতে দূর্গ নির্মাণে আত্বনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এই দুর্গ তাঁর জীবনে দুর্ভাগা শহর হিসেবে আবির্ভূত হয়। এখানেই তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইনের মৃত্যু হয়। পুত্র শোকে পাদ্‌শাহ বৎসরে দুই/একবার আজমীর ও ফতেহপুর সিক্রীতে যথাক্রমে খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তী (র.) ও সেলিম চিশতী (র.) দরগায় যাতায়াত শুরু করেন। ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেলিম চিশতীর উপদেশে

তাঁর স্ত্রী মরিয়ম উয-যামানীর জন্য ফতেহপুর সিক্রীতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন (ছবি নং ৩.৭) এবং এখানেই শাহজাদা জাহাঙ্গীরের (১৫৬৯ খ্রী:) জন্ম হয়। আকবরের জীবনে পুত্র সন্তানের লাভের মতই ফতেহপুর সিক্রী সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে আসে। সতের বছরের এই অবস্থান-কাল মোগল শিল্পকলার স্থাপত্য, চিত্রকলা, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় সময়।

৩.৭ ফতেহপুর সিক্রী দেয়ালের ফ্রেসকো, হাতি, এ্যালামি কালেকশান, লন্ডন, ১৫৬৮ খ্রি:

পাদ্‌শাহ আকবর পর্যন্ত ঈরাণী কলম রীতির চিত্র মোগল দরবারকে দখল করে থাকে। যদিও ভারতীয় আবহ একটু-একটু করে প্রবেশ করতে থাকে। তবে আকবর ও শাহজাদা জাহাঙ্গীরের তত্ত্বাবধানে মোগলদের উপর ভারতীয় প্রভাব বাড়তে থাকে। স্বাধীনতা, বাস্তবতা ও গতির আত্মবিশ্বাস পারসিক রীতিকে দেশজ রাজপুত রীতির (ছবি নং ৩.৮) সম্মিলনে এক নতুন ধারার জন্ম নেয় যা মোগল চিত্রকলা নামে আজ জগৎ বিখ্যাত। মীর সায়িদ আলী ও খাজা আবদুস সামাদের সাথে এখন বাসওয়ান, দশবন্ত, কেশুদাস এর সাথে একই রাজকীয় সম্মাননাতে একই ছবিতে একাধিক ব্যক্তির কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়।

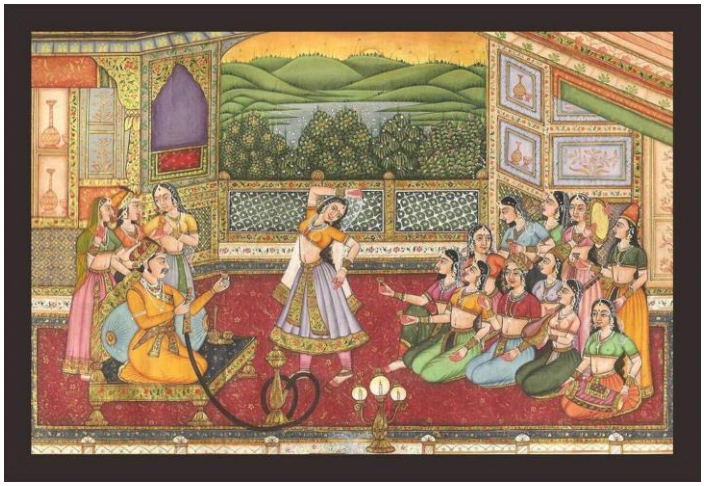
৩.৮ রাজপুত দরবার হল, রাজস্থান অফিস লাইব্রেরি, ভারত , ১৭ শতকের শেষ

আকবরের সময় মোগল চিত্রকলাতে বৈচিত্রতা আসতে শুরু করে। প্রধানত দুটি কারণে, তা হল- তিনি নিরক্ষর হোলেও তার ছিল প্রতিটি জিনিষের প্রতি অকৃত্তিম ভালবাসা ও আগ্রহ এবং সুন্দর কিছু অধিকার করার মত মেধা ও স্মরণশক্তি। দ্বিতীয়ত মানুষের সৃষ্ট জ্ঞান, দর্শন ও আধ্যাতিকতার সাথে পরিচিত হওয়া। বস্তুত পূর্ববর্তী

শাসকদ্বয় বাবুর ও হুমায়ূন উভয়ই অভারতীয়। কেবলমাত্র মহামতি আকবর উমরকোটে জন্ম নেয়া প্রথম ভারতীয় মোগল শাসক।

মসনদে বসে আকবর বাবার অসমাপ্ত কাজ 'দাস্তানে আমীর হামজা' চিত্রায়নে মনযোগি হন। 'দাস্তান' এর নতুন নামকরণ করা হয় 'হামজানামা'। ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে যখন বার খন্ডে চৌদ্দশত চিত্র তৈরী শেষ হয় তখন সেগুলো কয়েকটি খন্ডে সন্নিবেশ করে এ্যালবাম বা *'মুরাক্কা'* তৈরী করা হয়। তুলোর জমি বা তুলোট কাগজের এ্যালবাম সাইজের ছবিতে স্থির অলংকার হিসেবে মেঘ বা আকাশের দৃশ্য, পত্র-পল্লব ছাড়া নগ্ন গাছ, পারসিক ঐতিহ্যগত কাঠামোয় সীমাবদ্ধ। তবে শেষের খন্ডগুলিতে আশ্চর্যজনকভাবে বৈচিত্র, দ্যোতনা, অভিব্যক্তি, গতি ও আবেগ যুক্ত হয়। পরের খন্ডগুলো প্রথম দিকের খন্ডগুলির চাইতে অনেক বেশী পরিপক্ক ভাবে চিত্রন করা হয়।

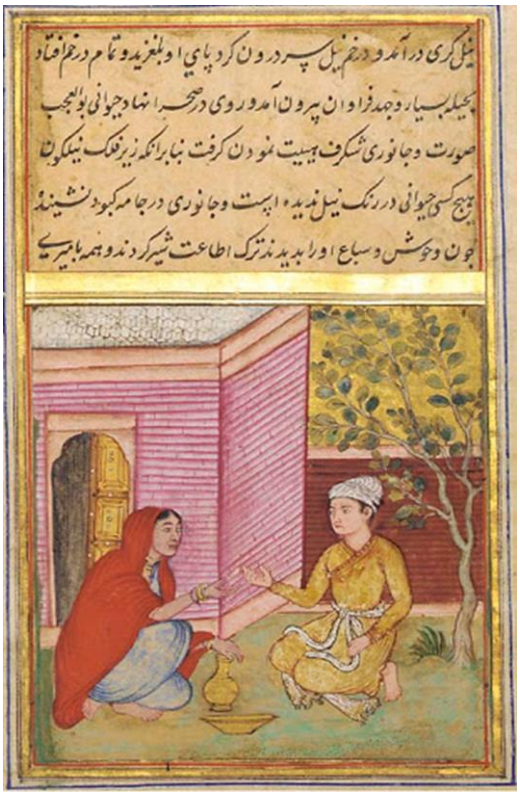

৩.৯ তুতিনামা, পারস্য চিত্রকলা, ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম, ১৫৬০ খ্রি:

১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে পাদ্‌শাহের নির্দেশে 'তুতিনামা' (ছবি নং ৩.৯) চিত্রায়ন শুরু হয়। ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়ামে রক্ষিত এর চিত্রায়নে পারসিক রীতি পড়ে রইল এবং ভারতীয় প্রভাব নেতৃত্বে এল। এরপর বাবরনামা, আকবরনামা, হরিবংশ ও রজমনামা পান্ডুলিপি আকারে ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই সময় শিল্পী আবদুস সামাদ, আবুল হাসান, আকা রিজা, আকিল খান, বাসওয়ান, ভবানীদাস, বিচিত্র, বিষেণদাশ, দশ্যন্ত, গোবর্ধন, কমল, কাশ্মীরি, কেশু, মনোহর, মনসুর, মীর সৈয়দ আলী, মিশকিনা, নয়নসুখ, রুকনউদ্দিন, সাহিবদিন, সুদর্শন রঞ্চা প্রমুখ শিল্পী তাঁর চিত্রশালাতে কাজ করেন। [৭]

পাদ্‌শাহ আকবর ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ফতেহপুর সিক্রী যখন গড়লেন তখন স্থপতি, ভাস্কর, রাজ-মিস্ত্রীর পর ডাক পড়ল চিত্রকরের। ফতেহপুর সিক্রীর দেয়ালে বেলে পাথরের উপর সাদা রঙের প্রলেপ তার উপর ছবি। ঈরানী রীতিতে আঁকার সাথে কিছুটা হল ভারতীয়। বোঝা গেল মীর সৈয়দ আলী ওখাজা আবদুস সামাদের সাথে স্থানীয় শিল্পীগণ মিলেমিশে এই দেওয়াল চিত্র অংকন করেছেন।

পাদ্‌শাহ আকবর 'জিল্লেইলাহি' বা সৃষ্টিকর্তার ছায়া উপাধিধারী ছিলেন। মোগল শাসকদের মধ্যে আকবর সর্বপ্রথম চিত্রকারখানার সূত্রপাত করেন। মনে রাখতে হবে, দরবারি শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে ছিল চিত্রকারখানা যা কার্যত শুরু সেই সুলতানি শাসন আমল থেকে। প্রাচীন ভারতের মধ্যেও এ ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল বলে কথিত আছে। যখন মোগল শাসকগণ এখন সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর কাজ করছেন তখন রাজপুত অভিযাতবর্গের রাজারা মোগলদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে সংযুক্ত হয়। আকবর তাঁর শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করতে 'মনসবদারি' প্রথা চালু করেন। ফলে প্রত্যেক সামরিক ব্যক্তিকে মাইনের বদলে দেয়া হত জায়গীর। তাদের উপর মোগল শাসকদের অগাধ নিয়ন্ত্রণ থাকায় তারা পাদ্‌শাহের কোন আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করতে পারত না।

রাজানুগ্রহে বেড়ে ওঠা অভিজাতবর্গরা কৃষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত শ্রমজাত উদ্বৃত্তকে আত্মসাৎ করত। অবাক হতে হয় একটি পরিসংখ্যান থেকে যেখানে বলা আছে, মূল জমার ১৮.৫৯ ভাগ গ্রহণ করত ১২ জন মনসবদার আর বাকি কর ভোগ করত ১০৭১ জন ব্যক্তি। মূলত এই অল্পসংখ্যক অভিজাতরা সাথেই ছিল রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা যা মোগল চিত্রকলার বিকাশে কাজ করে । বার্ণিয়ার অবশ্য মোগল শাসকদের কঠোর সমালোচনা করেছেন । যাই হোক, এই অভিজাতরা যখন কোন অভিনব জিনিষ দেখতেন তখন তাই সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আর চিত্রকলা সেই তালিকারই অন্তর্ভূক্ত। বার্নিয়ার অবশ্য মোগলদের নিন্দা করলেও স্বীকার করেছেন যে, ইন্ডিস এর কারুশিল্প টিকে থাকতনা যদি আমীর ওমরাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকত। 'মাসির-ই-রহিমি' তে এমন একজন সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক আব্দুর রহিম খানে খানানের উদারতার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। 'রিয়াজী-ই-খুশবুই'[৮] নামক গ্রন্থে অভিযাতদের গৃহে গড়ে ওঠা চিত্রকারখানা ও তদারকীর বিষয়ে যে বর্ণনা আছে তাতে জানা যায় এই ব্যবস্থা আঠারো শতক পর্যন্ত বিরাজমান ছিল।[৯]

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজলের বর্ণনাতে বলা হয়- প্রতি সপ্তাহে আকবর শিল্পীদের কাজ পরিদর্শন করতেন। পাদ্‌শাহের দারোগাগণ সপ্তাহান্তে সকল কাজ উপস্থিত করতেন। শিল্পীগণ যেমন পছন্দসই কাজের জন্য হোতেন পুরস্কৃত তেমনি মানহীন কাজের তিরস্কার স্বরুপ হোতেন বরখাস্ত। বস্তুত আকবর নিজেই পারস্য থেকে আসা শিল্পীদের নিকট হতে শিল্পশিক্ষা নেন। আবুল ফজলের বর্ণনায় পাওয়া যায়- মুসলিম উলেমাদের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি বলেন 'শিল্পীদের কর্মকে যারা অপছন্দ করে আমি তাদের ঘৃণা করি'।[১০] উপরন্ত তিনি বলেন- 'শিল্পী যখন কোন ছবি আঁকেন তখন তাঁর

মাধ্যমে তিনি স্রষ্টাকে স্মরণ করেন'।[১১] মহামতি আকবরের এই মতামত মুসলিমদের মনে গভীর ক্ষোভের সূত্রপাত করলেও তা শিল্পীদের কাজের ক্ষেত্রকে আরও স্বাধীন করে দেয়।

৩.১০.খাদ্য গ্রহণ, বাবুর থেকে জাহাঙ্গীর, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংগ্রহ, ১৬১৫ খ্রি:

আকবরের চিত্রকারখানায় মূল বিষয় ছিল গ্রন্থ চিত্রন (ছবি নং ৩.১০)। তথাপি প্রতিকৃতি চিত্রণ সম্পর্কে তার আগ্রহের কথা জানা যায়। আবুল ফজলের বর্ণনাতে আছে যে, আকবর নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কনের নির্দেশ দেন। একই সাথে তার সভাসদ ও আমত্যবর্গদের প্রতিকৃতি আঁকতে নির্দেশ দেন । চিত্রিত প্রতিকৃতিগুলি বিশেষ ব্যাবস্থাপনায় *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবাম আকারে বাধাই করা হয় । চিত্রিত *'মুরাক্কা'*র সংগ্রহটিতে আনেকের প্রতৃকতিই স্থান পায়। *'মুরাক্কা'*তে স্থান পাওয়া মৃত ব্যক্তিগণ নতুনভাবে জীবন ফিরে পায় এবং জীবিতগণ হয়ে ওঠেন আরও সম্মানিত । কিন্তু দুভাগ্যবশত আকবরের এই দুষ্প্রাপ্য এ্যালবামটির চিত্রিত বিচ্ছিন্ন কিছু পাতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।[১২]

পালকি বাহকের ছেল দশবন্ত জাতিতে ছিলেন কাহার। আকবরের কারখানার এই বিখ্যাত হিন্দু শিল্পী ভারতীয় স্থানীয় রীতিতে শেখা কলা-কৌশলকে পারস্য শিল্পীদের সান্নিধ্যে এনে নতুন মাত্রাদেন। প্রকৃতি সাদৃশ্য রুপায়ন যার মাধ্যমে বিষয়ের কাব্যগুণ অক্ষুন্ন থাকবে অথচ মানুষ, জীবজন্তু ও নিসর্গ সব কিছু আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে। এই কৌশল শিল্পীরা ইউরোপিয় কলা-কৌশল হতে শিক্ষা নেয়।

আকবরের শাসনামলে সম্মিলিত ভাবে শিল্পীরা কাজ করতেন। হুমায়ূন এর সাথে শিল্পী মীর সায়িদ আলী ও খাজা আব্দুস সামাদ দিল্লীতে এলেও এই শিল্পীদের বিকাশ ঘটে আকবরের শাসন আমলে। মীর সায়িদ আলী তাব্রিজ থেকে আর খাজা আবদুস সামাদ সিরাজ থেকে ভারতবর্ষে আসেন। খাজা আবদুস সামাদকে অনুচিত্র অঙ্কনে বলা হত 'শিরিণ কলম'। হুমায়ূনের আমলে তাঁর আঁকা 'বালক আকবর কর্তৃক তাঁর পিতাকে একটি ছবি উপহার দিচ্ছেন' শিরোনামের ছবিটি উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রের এ্যালবামে শিল্পী নিজের একটি মুখের ছবি আঁকেন। 'হামজানামার' অলংকরন গুলিতে তাঁর

দক্ষতা চোখে পড়ে। এ সময় মীর সায়িদ আলী মক্কাতে গেলে তিনি কাজটি সমাধা করেন। আকবর খাজা আবদুস সামাদকে চারশত মনসবদারীর পদে উন্নীত করেন। পরবর্তিতে আকবরের বাইশ বৎসর শাসনকাল পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁকে জাতীয় টাকশালের অধিকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে 'দিওয়ান' পদে নিয়োগ করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে বাদশাহ আকবর পিতার অসমাপ্ত কাজটি চিত্রায়নে হাত দেন। 'দাঁস্তানে আমীর হামজার' নতুন নামকরণ হয় 'হামাযানামা'। নতুনভাবে এই কাজ শুরু হয় ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে এবং এটি শেষ হয় ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। সর্বমোট ১৪০০টি চিত্র বারটি খন্ডে প্রকাশিত হয়।[১৩]

লক্ষ্যনীয় যে হুমায়ূনের সময়কার বা আকবরের প্রথমদিকের চিত্রগুলো পারসিক ধাঁচে তৈরী। ছবির মধ্যে চঞ্চলতা কম এবং চরিত্রগত ও বৈশিষ্ট্যগত ভাবে এগুলো ভারতীয় শিল্পী ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। তবে স্মার্তব্য যে- শেষের দিকের ছবিগুলো গতি, আবেগ এবং রঙ বৈচিত্রে পূর্ববর্তীদের চাইতে অনেক পরীক্ষীত ও পরিনত। তখনকার দিনে ফার্সি ও তুর্কী ভাষায় এ্যালবামের নাম ছিল *'মুরাক্কা'*। *'মুরাক্কা'* তৈরীতে পাদ্‌শাহ আকবরের আগ্রহের প্রমাণ রয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি তিনিই সবচেয়ে বেশী ঘটান। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনায় অনেক আঞ্চলিক প্রশাসক নিয়োগ দিতে হয়। পথের দূরত্বের কারণে অনেক শাসককে কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ করা যেতনা এবং তাদের বিদ্রোহ দমনে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহনে সময় লাগত। বাদশাহ আকবর আঞ্চলিক প্রশাসকদের প্রতিকৃতি অংকনের প্রতি গুরুত্বদেন। অর্থাৎ শাসক যদি বিদ্রোহ করে তবে তাঁকে যেন সহজে সনাক্ত করে শাস্তি দেওয়া যায়। একই ভাবে মৃত রাজকীয় সদস্য অথবা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্মৃতি থেকে মুছে না যায় তার কারনে *'মুরাক্কা'* তৈরীতে মনযোগি হন। অধিকন্তু জীবিতদের উৎসাহ ও সম্মাননা দেওয়ার জন্য তাদের প্রতিকৃতি সম্বলিত *'মুরাক্কা'* তৈরী করা হয়।

৩.১১ বাগান (চা**হার**বাগ), বাবুরের পরিকল্পনা, আগা খান সংগ্রহ , ১৬৩৫ খ্রি:

সুতরাং ঐতিহাসিকদের প্রমানাদী ও তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল চিত্রকলাতে সর্বপ্রথম *'মুরাক্কা'*র প্রচলন

করেন মহামতি আকবর বাদ্‌শাহ। ১৫৮৮ খ্রী: নবরত্নের চিত্র সম্বলিত একটি *'মুরাক্কা'*র বা এ্যালবাম আকবরের দরবারের খ্যাতিমান চিত্রকর বড়কেশু (কেশবদাশ) আকবরকে উপহার দেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই *'মুরাক্কা'*র কোন উপস্থিতি বহুদিন ছিল না । কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার আকবরের সেই বিখ্যাত *'মুরাক্কা'* র কিছু বিচ্ছিন্ন পাতা ১৯৭০ এর দশকে আগা খানের সংগ্রহে দেখা যায় যা সুইজারল্যান্ডের একটি প্রখ্যাত জাদুঘরে প্রদর্শিত হয়েছিল (ছবি নং ৩.১১) । তাই *'মুরাক্কা'*র অগ্রযাত্রা বাদশাহ আকবরের সময় হতে মোগল চিত্রকলাতে সংযোজিত হয় বলেই ধারণা করা হয় ।

তথ্যসূত্র

১. অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা* (প্রথম খন্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬, পৃ. ১০৫

২. সরসী কুমার সরস্বতী, *পাল যুগের চিত্রকলা,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫, পৃ. ৩৪

৩. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯৯

৪. এ.বি.এম হোসেন, *ইসলামী চিত্রকলা,* ঢাকা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৪, পৃ. ১৫৯

* (উত্তর ভারতের চিত্রকলা সম্পর্কে নাজমা খান মজলিশ 'উত্তর ভারতে সুলতানি চিত্রকলা : একটি সমীক্ষা' শিরোনামে প্রবন্ধে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । এবং এ. বি. এম হোসেন 'ইসলামী চিত্রকলা' বইয়ে এর সংক্ষিপ্ত বর্ননা করেছেন)

৫. Binyon, Wilkinson and Gray, *Persian Miniature Painting,* London, Oxford University Publication, 1933, p. 82

৬. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১০

৭. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৩

৮. রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরুপ : মুঘল চিত্রকলা,* কলিকাতা, থীমা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ১৭

৯. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭

১০. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ২৯৪

১১. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari,* tr., Blochmann, Calcutta, 1873, p. 108

১২. রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮

১৩. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১২

চতুর্থ অধ্যায়

মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়কালের মুরাক্কা

১৬০৫-২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল চিত্রকলার স্বর্ণযুগ। এর স্থপতি বাদশাহ 'নূর উদ্দিন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ গাজী'। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের চতুর্থ বাদশাহ ও মহামতি আকবরের অনেক সাধনার পুত্র সন্তান। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ফারসি, তুর্কি ও হিন্দি ভাষা এবং গণিত, ইতিহাস, ও ভূগোলে একজন পারদর্শি ব্যক্তি ছিলেন। বাদশাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুর রহিম খান বাদশাহকে অন্য সকল বিষয়ের সাথে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে হুমায়ূন ও আকবরের গড়ে তোলা মোগল চিত্রকলার একজন অধিকতর সমঝদার হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন কাব্য প্রেমিক। মোগল শাসকদের পরম্পরা স্থাপত্য বিদ্যা একটি বিকাশমান ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তথাপি জাহাঙ্গীর স্থাপত্যের প্রতি অতটা আত্মমগ্ন হননি যতটা হয়েছেন চিত্রশিল্পের প্রতি। বাদশাহ হুমায়ূন নির্বাসিত জীবনে চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। স্বীয় সাম্রাজ্য উদ্ধার করার পর পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরে এসে এই শিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। পিতামহের এই সুকুমারবৃত্তি যুবরাজ থাকাকালীন তাঁর মনে দাগ কাটে। গ্যারেটের সংগ্রহ 'জাফরনামায়' (ছবি নং ৪.১) জাহাঙ্গীরের লিখিত একটি মন্তব্য রয়েছে। তিনি লিখেছেন 'আল্লাহ মহান, মাওলানা শির আলী লিখিত 'জাফরনামা' গ্রন্থখানিতে আট জোড়া চিত্র রয়েছে এবং এগুলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী রীতি কৌশল বিশেষজ্ঞ ওস্তাদ বিহযাদ প্রথম যুগে অঙ্কন করেন, আমার স্বর্গপ্রাপ্ত পিতার গ্রন্থাগার হতে আমার সিংহাসনারোহনের প্রথম বছরে (১৬০৫ খ্রি.) এটি আমার গ্রন্থাগারে প্রদান করা হয়েছে, স্বাক্ষরকারী নুরুদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর শাহ আকবর'।[১] তাঁর এই মমত্ববোধ প্রপিতামহ হতে রক্তে মিশে আছে। আর বংশগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়- জাহাঙ্গীরের ধমণীতে মোঙ্গল চাগতাই এবং ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ রয়েছে। শিল্প বোদ্ধা পারসি ব্রাউন মনে করেন, মধ্য

৪.১ জাফরনামা, তৈমুরের সিংহাসনে বসা, জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ , ১৬২০ খ্রি:

এশিয়া ও ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণের ফলে বাদশাহের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অ-ভারতীয় বলা যায় না। কারণ জাহাঙ্গীরের চিন্তাধারায় যে অন্তর্মূখী প্রবাহ পরিলক্ষিত হয় তাই পরবর্তীতে মোগল চিত্রশিল্পকে জাতীয় চিত্রশালা ও প্রকৃত মোগল চিত্রশালায় রূপান্তরিত করে।[২] তাঁর নিজের বংশ পরম্পরা পারস্য-তূর্কী এবং রাজপুত মিশ্রণের মতই চিত্রকলাও ভারতীয়করণ হয়ে অগ্রযাত্রা শুরু করে। তাঁর কর্মদক্ষতায় মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল যেমন পরিপক্কতায় পৌঁছায় শিল্পকলাও তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়। সে কারণে তাঁর সময়কালকে মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

মোগল চিত্রকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই প্রাথমিকভাবে এটি ছিল সম্পূর্ণ পারস্য রীতি নির্ভর। হুমায়ূন পারস্য থেকে আনা মীর সৈয়দ আলী ও খাজা আব্দুস সামাদের উপর যে দায়িত্বার্পণ করেন সেখানে স্থানীয় শিল্পীদের উপস্থিতি থাকলেও কৌশলগত অধ্যায়টি ছিল অভারতীয়। আকবরের সময় তার কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়।

সমসাময়িক আলেম-উলামাদের ফতোয়া সত্ত্বেও আকবর সেদিকে তোয়াক্কা করেননি। উপরন্ত তিনি চিত্রকরদের কাজের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, শিল্পী ঈশ্বরকে স্মরণ করে তার নিজস্ব উপায়ে। যখন সে জীবন্ত বস্তুর চিত্র রচনা করেন তখন সে স্মরণ করে তাঁর নির্মাতাকে।[৩] আবুল ফজলের আইন-ই- আকবরির এক বর্ণনাতে আছে- আকবর প্রতি সপ্তাহে চিত্রকরদের কাজ পরিদর্শন করতেন। তাঁর দারোগারা সকলের কাজ উপস্থাপন করতেন।[৪] বাদশাহ সন্তুষ্ট হলে মিলত পুরস্কার আর অসন্তুষ্টিতে কি হত তার কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। রাজকীয় তত্ত্বাবধান ও অভিজাতগণ ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। প্রসংগত 'মাসির-ই-রহিমিতে' উল্লেখ আছে আকবরের সময় সরকারি খাজনা এর ১৮.৫৯ ভাগ টাকা ১২ জন মনসবদার এবং বাকী ৮২ ভাগ টাকা ১০৭১ জন অভিজাতবর্গ ভোগ করতেন। সুতরাং সামন্ততান্ত্রীক চিন্তা ভাবনাতে বলতেই হয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি নেই। বাদশাহ হওয়ার পূর্বে জাহাঙ্গীর যুবরাজ হিসেবে প্রায় দু' দশক কাল এ সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর দীর্ঘ ২২ বছরের রাজত্বকাল সৌভাগ্যক্রমে দু'একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়া মোটামুটি স্বস্তিতেই রাজ্য পরিচালনা করেন।

মোগল চিত্রকলা জাহাঙ্গীর এর শাসনামলে এত বিখ্যাত হওয়ার পেছনে কতগুলো কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত জাহাঙ্গীরের শিল্পানুরাগ ও শৈল্পীক ব্যক্তিত্ব, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ[৫], তৃতীয়ত সাম্রাজ্যের আর্থিক স্বচ্ছলতা, চতুর্থত শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি সহনশীল ও চিন্তার

স্বাধীনতা দান এবং পঞ্চমত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি শক্তিশালী সংগ্রহ। কথিত আছে সেই সময় ২৪ হাজারের মত মূল্যবান গ্রন্থরাজি ও শিল্পকর্ম বিদ্যমান ছিল।

মোগল চিত্রকলা বাদশাহ হুমায়ূনের সময় ছিল পাণ্ডুলিপি নির্ভর। বাদশাহ আকবরের সময় তার উন্নতি ঘটে। তিনি পাণ্ডুলিপি ও বিচ্ছিন্ন চিত্রায়নে মনোনিবেশ করেন। আবুল ফজলের বর্ণনাতে রয়েছে- আকবর তাঁর প্রতিকৃতি তৈরীতে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে ঘন্টার পর ঘন্টা শিল্পীদের সামনে বসে থাকতেন। একই ভাবে সব আমীর ওমরাদের প্রতিকৃতি তৈরী করিয়ে নেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই সকল প্রতিকৃতির সমন্বয়ে তিনি মোগল *'মুরাক্কা'*র ভারতীয় পর্বের সূত্রপাত করেন। ফলে যারা মৃত তাঁরা নতুনভাবে জীবন ফিরে পান এবং যারা জীবিত তাঁদের দেওয়া হয় অমরত্বের প্রতিশ্রুতি। আকবরের এই ধারণা মোগল প্রতিকৃতি ও *'মুরাক্কা'* সৃষ্টির প্রধান নিয়ামক হিসেবে দাড়ায়। এই ক্ষেত্রে বাদশাহ জাহাঙ্গীর আরও অগ্রসর হন। তাঁর সময় মোগল চিত্রকলা প্রধানত তিন ধরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অংকিত হয়। মিনিয়েচার বা পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ন, পর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি অংকন এবং ফুল, লতা-পাতা, জীব-জন্তু চিত্রায়ন। এই সময়কার মিনিয়েচারের বিষয়বস্তু ছিল শিকারের দৃশ্য, চিত্ত বিনোদনমূলক ও লড়াই সংক্রান্ত। প্রতিকৃতি এশিয়ান চিত্রশিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও মোগল চিত্রশালায় বিশেষত জাহাঙ্গীরের সময়কালে প্রতিকৃতির ন্যায় অপর কোন শিল্প এত চরম উৎকর্ষে পৌছেনি। এই সময়কালে স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবজ্জ্বল যুগের সূচনা করে প্রতিকৃতি অংকন। মোগল প্রতিকৃতি আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত তিন-চতুর্থাংশ রীতি (three quarter view) এবং দ্বিতীয়ত প্রফাইল (profile)। বলা দরকার পারস্য শিল্পীগণ মানুষের চিত্রাংকনে তিন-চতুর্থাংশ রীতি ব্যবহার করতেন। আর প্রাচীন ভারতীয় রাজপুত নীতিতে প্রফাইল (fore-shortering) এর প্রয়োগ হয়।[৬] জাহাঙ্গীর প্রথোমক্ত রীতি বেছে নেন এবং পাণ্ডুলিপি নির্ভর চিত্রকলা হতে মোগল চিত্রকলা বেরিয়ে আসে। জাহাঙ্গীরের দায়িত্বভার প্রাপ্ত আব্দুর রহিম খানে খানান নিজে বাদশাহকে চিত্রশিল্পের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করেন। প্রকৃতিচিত্রন, নরনারীর প্রতিকৃতি, বিদেশী ও ধর্মীয় বিষয়াদী তিনি পছন্দ করতেন। বাদশাহ

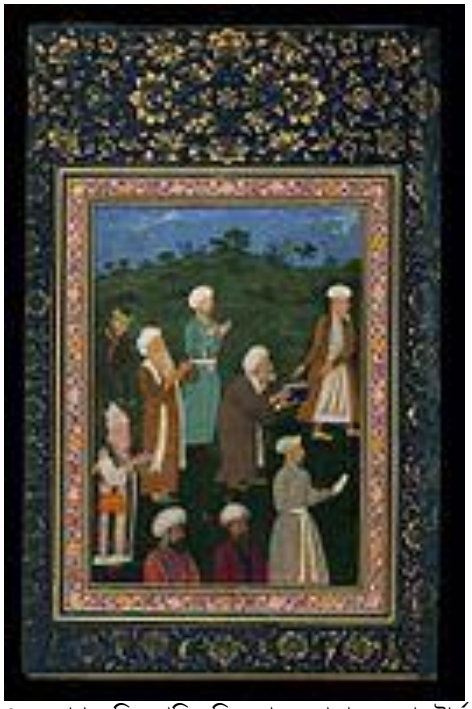

৪.২ শেখ সদির প্রতিকৃতি, আবুল হাসান, ওয়ালটার্স আর্ট মিউজিয়াম, ১৬১৫ খ্রি:

জাহাঙ্গীর মোগল চিত্রকলাকে পরিণতির শীর্ষে নিয়ে যান। তার রক্তে বাবুরের রুচী ও শালীনতা ফুটে ওঠে। চিত্রকরদের তিনি অত্যাধিক সম্মান করতেন। এ সময় তাঁর দরবারে ইউরোপিয় আসতে থাকে। তাদের লেখনীতেও বিষদ বর্ণনা রয়েছে। শিল্পী আবুল হাসান (ছবি নং ৪.২) যার উপাধি 'নাদির-উজ-জামান' তাকে দরবারের একটি ছবি উপহার দেন। হাসানের বাবা আকা রিজার আঁকা প্রোট্রেট (portrait) তিনি পছন্দ করতেন। আর মনসুর ছিলেন নক্সা বিদ্যার ওস্তাদ। তার উপাধি 'নাদিরুল-উল-আসর'।[৭] জাহাঙ্গীর এতটাই চিত্র সমঝদার ছিলেন যে নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন 'আমি খুব ছবির ভক্ত এবং সমস্ত শিল্পীর কাজ এত বেশী চিনি যে জীবিত বা মৃত যে কোন শিল্পীর কাজ দেখলেই বলে দিতে পারি। যদি একই ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের পোট্রেট ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হাতের আঁকা হয়ে থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের নাম বলে দিতে পারি। বলে দিতে পারি কে কপাল এঁকেছেন, কে চোখের পক্ষ্ম একেছেন কিংবা ছবিটি তৈরী করার পর কে সেটিকে ঠিকঠাক করে দিয়েছেন'।[৮]

প্রকৃতির সৃষ্টিকে আঁকা জাহাঙ্গীরের নেশা ছিল। ইউরোপীয় ছবিতে যেমন যা দেখেছি (অর্থাৎ বাস্তবধর্মীতা) তাই ফুটিয়ে তোলা ভারতীয় ছবিতে ছিল না। ভারতীয় শিল্পীরা মডেলকে বসিয়ে কদাচিৎ ছবি আঁকতেন বরং বিষয়টি খুব সর্তকভাবে নিরীক্ষণ করে চোখের মধ্যে যে ছবি থাকত তাকে কাগজে ফোটানো হত। মডলিং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরত্ব ইউরোপের ছবির বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভারতীয় ছবিতে গভীরত্ব ছিল না। ফলে ছবি হতে থাকে ফ্লাট বা চ্যাপ্টা।

জাহাঙ্গীরের সময় উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের উপর অনেক ছবি আঁকা হয়। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি হচ্ছে টার্কি মোরগের ছবি। ওস্তাদ মনসুরের আঁকা ও জাহাঙ্গীরের সীল মোহর দেওয়া। জাহাঙ্গীরের দূত মকবর খাঁ গোয়া থেকে দুস্প্রাপ্য কয়েকটি প্রাণী এনে বাদশাহকে উপহার দেন তার মধ্যে ঐ টার্কি মোরগটি ছিল।[৯] প্রাণিটি সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের বর্ণনা এমন ছিল 'ওদের মধ্যে একটি দেখতে কতটা ময়ূরীর মত, তবে ময়ূরীর চেয়ে একটু বড় আকার আবার ময়ূরের চেয়ে ছোট। যখন তার সঙ্গিনীর সাথে মিলতে ইচ্ছা হয়, লেজ পালক মেলে ধরে, ময়ূরের মত নেচে বেড়ায়। ঠোট আর ঠেং সাধারণ পোষা মুরগীর মত' (ছবি নং ৪.৩)। অন্য একটি ছবি কলকাতার মিউজিয়ামে আছে।[১০] প্রাণীটি ফ্লোরিকান এবং চিত্রকর যথারীতি মনসুর।

৪.৩ টার্কি মোরগ, মনসুর, ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ১৬১২ খ্রি:

আর তৃতীয় ছবিটি একটি সারসের। এ সময় চিত্রিত ফুল-লতা পাতার এ্যালবামটিও বিস্ময়কর চিত্রণ।

জাহাঙ্গীরের সময়ে অন্য একটি বিস্ময়কর পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্যণীয় তা হলো ছবির ফ্রেম এবং ছবির পাড়। ফুল লতা-পাতা শোভিত চওড়া পাড় মোগল মিনিয়েচার ছবির রেওয়াজ থাকলেও জাহাঙ্গীরের দরবারে এর চূড়ান্ত রুপ ফুটে ওঠে। পপি, বুনো ষ্ট্রবেরী, জংকুইল, লিলি, আইরিশ, মার্গরিট ইত্যাদি পাহাড় ও সমতলে ফোটা ফুল ও লতাগুল্মোর শোভিত পাড় ওয়ালা ফ্রেম সত্যই অনিন্দ সুন্দর। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ভ্রমনের সময় এসব ফুল দেখলে শিল্পীদের দিয়ে তা স্কেচ করিয়ে রাখতেন এবং পরে তাঁর 'মুরাক্কা'র জন্য সেই সব ফুলের চিত্র হৃদয়গ্রাহী করে আঁকিয়ে নিতেন।

বাদশাহ কেশরহীন সিংহের শিকার পছন্দ করতেন (ছবি নং ৪.৪)। এমনই একটি ছবিতে হাতি ও সিংহ যুদ্ধ চলছে। হাতিটি চিৎকার করে প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। হাতির পিঠে বাদশাহ বন্দুক দিয়ে বাচাঁর প্রানান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পার্শ্বের ছবিতে বল্লমরক্ষী বাহিনী ইতোমধ্যে পৌছিয়েছে। তবে দেহরক্ষীরা প্রাণভয়ে বাদশাহকে রেখে পশ্চাদগমণ করছে। বিপদের সাথে বিদ্রুপাত্বক এই ছবিতে ব্যবহৃত দুরের পাহাড়, তালগাছ, মোচাঝোলা কলাগাছ, আমগাছের কচি পাতা ওয়ালা ডাল সবই স্থানীয় আবহে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৪.৪ জাহাঙ্গীরের সিংহ শিকার, মনোহর, রামপুর স্টেট লাইব্রেরি, ১৬১০ খ্রি:

জাহাঙ্গীরের চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ কত প্রখর ছিল তার বর্ণনা ইংল্যান্ডের দূত থমা ইংরেজ শিল্পী আইজাক অলিভারের আঁকা তার বন্ধুর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি (miniature) ছবি বাদশাহকে উপহার দেন। বাদশাহ ছবিটি থেকে হুবহু নকল করে আরে পাঁচটি ছবি তৈরী করান। ছবিগুলোর মধ্যে আসল ছবিটি খুজে পেতে টমাস রো ব্যর্থ হন। এই সময় শিল্পী মনোহরের আঁকা বাদশাহের একটি পোট্রেট থমাস রোকে উপহার দেয়া হয়।

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারের শিল্পী মনসুর সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে চতুষ্পদ জন্তু ও পাখি এঁকে (ছবি নং ৪.৫)। উল্লেখ্য হাতি ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। জাহাঙ্গীরের শিল্পী আবুল হাসান নিজেই অনেক হাতির ছবি আঁকেন। জনসন সংগ্রহের ৬৭ তম খন্ডটি গোটাটাই হাতির চিত্র সম্বলিত।

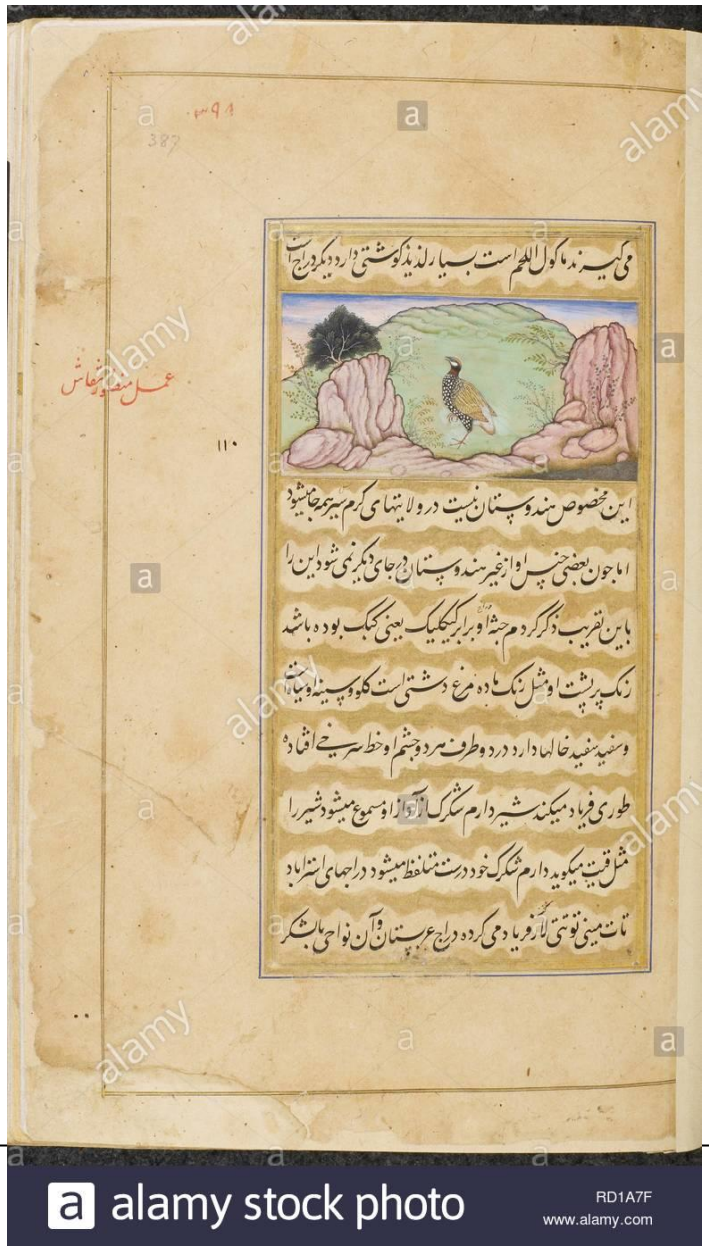

যুবরাজ সেলিম (পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর) যিনি সমসাময়িক সাক্ষ্যে আকবরের রাজনৈতিক প্রতিভার যোগ্য উত্তরসূরী বলে গণ্য হতেন না তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এলাহবাদে তার স্বাধীন দরবার বসান। তিনি সেখানেই গড়ে তোলেন স্বতন্ত্র চিত্রকারখানা। সেখানে ভারতীয় ছাড়াও ইরান ও মধ্য এশিয়ার শিল্পীরা কাজ করে। জাহাঙ্গীরের সময় শিল্পীদের ব্যক্তি প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। পুঁথি চিত্রনে বাদশার আগ্রহ থাকলেও প্রতিকৃতি অংকনের প্রতি এবং সংগ্রহের প্রতি তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার আমলেই *মুরাক্কা'*র বিশাল সংগ্রহ পাওয়া যায় যাতে ইউরোপীয় চিত্রের অনুকরণ, ওস্তাদ মনসুরের জীবজন্তুর ছবি আর আবুল হাসানের আঁকা প্রতিকৃতি। বৃটিশ দূত স্যার টমাস রো তাঁর আত্মজীবনীতে চিত্রকলার প্রতি বাদশাহের আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। টমাস রো ইংরেজ শিল্পী আইজাক অলিভারের আকাঁ তাঁর বন্ধুর একটি ক্ষুদ্রাকার চিত্র তাকে উপহার দিলে তিনি খুশী হলেন। এতে বোঝা যায় ভিনদেশের চিত্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ।[১১]

বাদশাহ শুধু ইউরোপিয় অনুকরণেই ছবি করেননি তিনি যুগের বিস্ময় বিহযাদের ছবির অনুকরণে চিত্র তৈরীর নির্দেশ দেন। শিল্পী নানহা তা আঁকেন। শিল্পী আকা রিজা পারসিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চিত্রে মনোযোগি হন। বলতে গেলে জাহাঙ্গীরের আমলেই ইউরোপিয় চিত্রকলার নিসর্গদৃশ্য এবং প্রতীক ও প্রতিকৃতির প্রভাব মোগল চিত্রকলাকে প্রভাবিত করে।

*'মুরাক্কা'*র একটি চিত্রে দেখা যায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলের এক প্রখ্যাত চিত্রকর লিখেছেন- 'আল্লা-হো-আকবর, বা হুকুম ই শাহ জাহাঙ্গীর নকস-ই-ইন তসবির নমুদ বান্দা, দৌলত, সবিহ-ই-খুদ, তহরিব কৈলা, ওয়া রকিমা ফকির অল হকির দৌলত। ঈশ্বর মহান। এই ছবি এঁকেছেন দৌলত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আদেশে। এটি দৌলতের নিজেরই প্রতিকৃতি। সেই গরিব, অধম, অকিঞ্চিতকর দৌলত, সেই এই ছবির রচয়িতা'। ইতিহাসের নিরবতা ভেঙে চিত্রকরগণ গোপন কর্মকে এভাবে নিজের বলে প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁরা বাদশাহের বান্দা, পায়ের নীচের ধুলা, অধমের অধম বলে নিজেদের দস্তখত দিতেন। একটি কথা প্রচলিত আছে যে শিল্পী যতই বড় হোক শাসকদের সাথে তাদের সম্পর্কে ছিল ভৃত্য-মনিব সম্পর্ক।[১২]

জাহাঙ্গীরের তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত *'মুরাক্কা'*র সর্ববৃহৎ দৃষ্টিনন্দন সংগ্রহ *'মুরাক্কা-ই-গুলশান'*। প্রাচীনতম এই এ্যালবামটি তেহরানের গুলিস্তান প্যালেস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। আর দ্বিতীয় সংগ্রহটি বার্লিনে জার্মান জাতীয় লাইব্রেরীতে। বিচ্ছিন্ন অংশগুলো পৃথিবীর অন্যান্য স্থানগুলোতে রয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য সংগ্রহগুলো প্যারিসের মিউজে গীমে এবং চেষ্টারবেটি লাইব্রেরীতে আছে। *'মুরাক্কা-ই-গুলশান'* সংকলন কাল ১৫৯৯-১৬০৯ এবং দ্বিতীয়টি ১৬০৮-১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সংগ্রহগুলোর পরিমাপ ৪০×২৪ সে.মি.। বস্তুত 'গুলশান' এ্যালবামে স্থান পাওয়া চিত্রকর্মগুলো সংখ্যাতে অধিক। পারস্য চিত্রকলার বিখ্যাত চিত্রকর কামালুদ্দীন বিহযাদ হতে শুরু করে দ্বিতীয় মোগল বাদশাহ হুমায়ূন এর শিল্পকর্ম এখানে স্থান পেয়েছে। অন্য *'মুরাক্কা'*র সংগ্রহে চিত্রের সংখ্যা পঁচিশটি। বলা বাহুল্য যে উভয় সংগ্রহেই রাজন্যবর্গ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, রাজ-অন্তপুরের মহিলাগণ, বিশেষ-বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ, চিত্রকর, লিপিকার, রাজদরবারের অভারতীয় অর্থাৎ বিদেশী কুটনৈতিক, পরিব্রাজক, লেখক এবং অল্পবিস্তর দক্ষিণভারতীয় চিত্রসমূহ লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্যণীয় *'মুরাক্কা'*তে চিত্রাবলীর পাশাপাশি লিপিকারদের সুন্দর লিপিকলা বা ক্যালিগ্রাফী ও (Calligraphy) শোভা পেত। আবার ছবি বা লিপির পাতাতে পারস্য শিল্পরীতির উত্তরসূরী হিসেবে 'হাশিয়া' বা প্রান্তিক নক্সা (marginal decoration) ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। 'হাশিয়া'য় ছবি ও বর্ণনামূলক তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশিত থাকত। 'হাশিয়া'র ব্যবহার ছবি/ লিপির ক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের একঘেয়েমীকে দূর করে বৈচিত্রতা বৃদ্ধি করে।

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের *'মুরাক্কা'* সংগ্রহে যে সকল শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে তাদের চিত্রকরগণ খ্যাতিমান এবং ঐতিহ্য ধারক। কেননা, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই খ্যাতির শীর্ষে অবস্থানের পেছনে প্রধানত দুইটি বিষয় উল্লেখ্য। প্রথমত শিক্ষানুরাগ, শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব এবং উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত মজবুত ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাজকীয় চিত্রশালা এবং দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। পারস্য ও মোগল সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চিত্রশালাতে বহুমাত্রিক শিল্পরীতির সমন্বয় সাধন। যদিও বাদশাহ হুমায়ূন ও আকবর পূর্ণ মোগল ঘারানা প্রতিষ্ঠায় ব্যার্থ হন কিন্তু জাহাঙ্গীরের কৃতিত্ব এক্ষেত্রে শতভাগ। তথাপি রুচিবোধ ও পছন্দমাফিক শিল্পকর্ম তৈরীর অন্যতম শর্ত ভালো আঁকিয়ে। সৌভাগ্যবান বাদশাহ তা যথাযথভাবেই পেয়েছিলেন। পারসি ব্রাউন যথার্থই বলেছেন 'আকবর যে ডিম পাড়েন তাতে জাহাঙ্গীর তা দেন'।[১৩] চিত্রকরদের মধ্যে আকা রিজা, দৌলত এবং হিন্দুচিত্রকর বিশনদাশের স্বাক্ষরিত শিল্পকর্ম *'মুরাক্কা-ই-গুলশানে'* পাওয়া যায়। আর বার্লিনে রক্ষিত এ্যালবামে ভারতীয় চিত্রকর বিশনদাশ, মনোহর, বলচন্দ্র, গোবর্ধন, আগা রিজার এবং আবুল ফজলের পুত্র আবুল হাসানের নাম উল্লেখ যোগ্য।

প্রতিকৃতি অঙ্কন বিশেষত *'মুরাক্কা'*তে স্থান পাওয়া প্রতিকৃতি গুলো জাহাঙ্গীর একটি ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্যে চিত্রায়ন করেন। কেননা মোগল প্রতিকৃতি ছিল কোন বিখ্যাত স্থাপত্য অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে পশ্চাৎপট (back ground) করে চিত্রিত। বাদশাহ সে ক্ষেত্রে গাঢ় কোন রঙের প্রলেপ দেওয়া জমিন যেমন আসমানী, নীল অথবা গাড় সবুজ রঙকে বেছে নেন। ক্ষেত্র বিশেষে প্রকৃতির সুশোভিত দৃশ্য অথবা প্রকৃতির দৃশ্যের সাথে ফুল ফল শোভিত পল্লব এর সাথে পাখির চিত্র সম্বলিত প্রশ্চাদপদ দৃশ্যই চোখে পড়ে। চিত্রিত প্রতিকৃতির মুখাবয়াব 'একচশমী' অর্থাৎ পার্শ্বদর্শন (profile) রীতি বহুল প্রচলিত ছিল। এতদিন প্রতিকৃতি অংকনে তিন-চতুর্থাংশ রীতি অনুস্বরণ করা হত। এ ধরণের দৃশ্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ক্রফট মুররাই সংগ্রহে মনসুরের আঁকা 'একজন বীণা বাদকের ছবি' এবং বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত 'বাদশাহ বাবুরের একটি প্রতিকৃতি' চিত্রে এমনই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিকৃতি অংকনে একক চিত্রায়ণ এর সাথে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে মোগল দরবারী, রাজকীয় পরিবার এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাদশাহ ও সাধারণ মানুষের দর্শন দৃশ্য অংকনও চোখে পড়ে। এ ধরণের রীতির উদাহরণ হচ্ছে- বোষ্টন মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টসে রক্ষিত আবুল হাসানের অঙ্কিত 'দরবারের দৃশ্য', লেলিনগ্যাদ ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটে সংরক্ষিত 'বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অভ্যর্থনার দৃশ্য', ভিক্টোরিয়া এন্ড এলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দের 'বাদশাহের একান্ত দর্শনদানের দৃশ্য', 'যুবরাজ পারভেজের অভ্যর্থনার দৃশ্য', বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত 'মোগল পরিবারের আনুষ্ঠানিক

চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। তবে ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে 'শাহজাদা খুররমকে ওজন করা'র দৃশ্যটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মোগল শাহজাদাদের দরবারী রীতি অনুযায়ী বৎসরে একবার সোনা-রূপা ও মনিমুক্তার বিপরীতে ওজনের রেওয়াজ ছিল। 'তুলা দোনা' নামক অনুষ্ঠানটি সাধারনত ঐ ব্যক্তির জন্মদিনে পালন করা হতো। বৃটিশ মিউজিয়ামে এমন একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে- বাদশাহের সভাসদবর্গবেষ্টিত অবস্থায় শাহাজাদাকে ওজন করছেন (ছবি নং ৪.৬)। দরবারের সকল সভাসদদের পরিচয় 'হাশিয়া'তে এবং তাদের পরিধেয় বস্ত্রে নির্দেশিত আছে। সম্মান প্রদর্শনে সভাসদদের সুন্দর নকসা সম্বলিত কার্পেটের উপর নগ্নপা, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, চীনা মাটির ও কাঁচের তৈজসপত্র, উপঢৌকন সমূহের সাজানোর বিন্যাস ইত্যাদি সবই নিখুঁত ও দর্শনীয়।

৪.৬ শাহজাদা খুররমকে ওজন করা, বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন, ১৬১৫ খ্রি:

(ক) *'মুরাক্কা-ই-গুলশান'*

আকবর ও জাহাঙ্গীর প্রতিকৃতি আঁকার উপর জোর দেন, এমনকি পেশাদার প্রতিকৃতি আঁকিয়ের যেমন 'সিটিং' নিয়ে নিখুঁতভাবে মুখাবয়ার ও ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার দিকে নজর দেন, তাঁরাও সেভাবে তাঁদের প্রিয় ও পরিচিতজনের বাস্তবানুগ প্রতিকৃতি আঁকিয়ে রাখতেন। জাহাঙ্গীর এ বিষয়ে এত বেশী নজর দিতেন যে তাঁর আত্মজীবনীতে সোচ্চার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কোন প্রতিকৃতি দেখলেই বলতে পারবেন সেটি কার আঁকা, আর যদি তাতে একাধিক শিল্পীর হাত থাকে তবে কে কোন অংশটি এঁকেছে তাও সঠিকভাবে বলতে পারবেন।[১৪]

জাহাঙ্গীর যখন বাদশাহ হননি তখন যুবরাজ সেলিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন পিতা মহামতি আকবরের বিরুদ্ধাচারণ করে এলাহাবাদের দূর্গে আশ্রয় নেন এবং পাঁচ বছরের কাছাকাছি সময় বিদ্রোহী জীবন কাটান তখন সেখানে ছবি আঁকানোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। প্রকৃত পক্ষে আকবর যখন ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে চিরতরে ফতেহপুর সিক্রী পরিত্যাগ করে লাহোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন তখন থেকে ছবির প্রতি সেলিমের বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়। দুর্লভ পুঁথি বা পারস্যের নামি দামী শিল্পীর ছবি সংগ্রহের দিকে তাঁর ঝোক ছিল। একজন কৃতি পারসিক শিল্পী আকা রেজাকে তাঁর খাস চিত্রকর হিসেবে নিযুক্ত করেন। এরপর '১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন গোয়া থেকে ফাদার জেরোম (জেরোনিমো) জেভিয়ারের নেতৃত্বে জেসুইটদের দল তৃতীয়বার আকবরের দরবারে উপস্থিত হন তখন সেলিম পাশ্চাত্য চিত্রকলার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। জেসুইটরা বিশ্বাস করতো আকবর ও সেলিম খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জেরোম জেভিয়ার সেলিমকে মন দিয়ে একটি এ্যালবামের পাতা উল্টে খ্রিষ্টধর্মের বিশেষ মোটিভে অংকিত বিদেশি ছবি পরীক্ষা করতে দেখেছেন বলে ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে লেখা একটি পত্র থেকে জানা যায়'।[১৫] তিনি এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, সেলিমের শিল্পীরা নকল করতে বা আসল ছবির অনুকরণে নিপুন হাতে উঁচুমানের ছবি আকঁতে একেবারে সিদ্ধহস্ত। সেলিম অনেক সময় তাঁর শিল্পীদের জেসুইটদের কাছ থেকে ছাপাই ছবির উপর রং চাপাবার সময় আসল ছবির রঙ কীরকম ছিল জানবার জন্য পাঠাতেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই এ্যালবাম বা *'মুরাক্কা'*র হদিশ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি দুটি নয় ডজন ডজন ছোটবড়ো ইউরোপিয়ান ছাপচিত্র আর একেবারে আসল ছবিতে যে রকম বর্ণবিন্যাস অবিকল সেইরকম রঙে পরিস্ফুট বেশ কিছু ছবিও রয়েছে এই *'মুরাক্কা'*য় (ছবি নং ৪.৭)। এই এ্যালবামটি শেষ হতে অনেক সময় লেগে যায় এবং সম্পূর্ণ হওয়ার পর বাদশাহের খাস তসবীরখানাতে রাখা হয়। এবং এই *'মুরাক্কা'*টির নাম *'মুরাক্কা-ই-গুলশান'*। বর্তমানে পারস্যের রাজধানী তেহরানের রাজকীয় সংগ্রহশালাতে জমা আছে। এ্যালবামের থেকে অপসৃত কিছু পৃষ্ঠার সন্ধান মুখ্যত বার্লিনের জাতীয় গ্রন্থাগারে চব্বিশ পৃষ্ঠার একটি এ্যালবাম ও আমেরিকার বিভিন্ন সংগ্রহে প্রদর্শিত অনেকগুলি পৃষ্ঠা

৪.৭ জাহাঙ্গীর, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, বৃটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন, সপ্তদশ শতকের প্রথমাংশ

প্রকাশিত হওয়ায় তার সম্পর্কে জানা যায়। আর তেহরানে রক্ষিত এ্যালবামটি চিত্র সমালোচক ও গবেষক আশোক কুমার দাস ওয়াশিংটনের স্মিথসনিয়ান ইন্সটিটিউশন কর্তৃক আমন্ত্রীত হয়ে *'মুরাক্কা'* সম্পর্কে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনার জন্য বিশেষজ্ঞ দলের সাথে যোগ দেন। সেখানে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর এ্যালবামের প্রতি পৃষ্ঠার লাগানো লিপিশিল্পের নমুনা ও ছবি এবং চারিদিকের মর্জিনের অলংকরণের মাঝে সূক্ষ রেখার অনুচিত্র গুলি পরীক্ষা করে যুবরাজ সেলিমের শিল্পভাবনা ও তাঁর শিল্পীদের উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুন্যের প্রকৃত পরিচয় পান। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'হাশিয়া'র অনুচিত্রগুলি আমাদের চোখের সামনে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয় যা এতদিন দরবারীচিত্র পরম্পরায় প্রত্যাশিত নয়। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বার্লিন অথবা আমেরিকার সংগ্রহে প্রদর্শিত ছবিগুলোতে 'হাশিয়া'য় বা অলংকরন প্রদর্শিত হলেও তেহরানের অলংকরনের ক্ষেত্রে তার বৈচিত্রতা রয়েছে। এই অলংকরণের মধ্যে একদিকে যেমন বাদশাহকে কখনও শিকারে, কখনও সিংহাসনের উপর, কখনও কবিতা বা সংগীতের আসরে, আবার কখনও সুফিসন্ত বা যোগীদের সাথে আলোচনায় ব্যাস্ত দেখা যায়। অন্যদিকে কবি, লেখক, সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর, লিপিকার, পূজারী, মোল্লা ও প্রাত্যহিক জীবনের নানা রকমের কাজ যেমন শরবত তৈরী, বাগিচায় গাছ লাগানো, কাগজ তৈরী, তাঁত বোনা, পানচাক্কি ঘুরিয়ে জল তোলা, মূল্যবান রত্ন কাটাই ও পালিশ করা, অস্ত্রশস্ত্র তৈরী, অসিযুদ্ধ ইত্যাদি কাজে দেখা যায়। আর মোগল রাজদরবারের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যের ও পারিবারিক জীবনাচার পালনের স্থান 'জেনানামহলে'র অনেক খন্ডচিত্রের মধ্যে রুটি তৈরী, মালা গাঁথা, লালগোলাপের নির্যাস হতে গোলাপি আতর তৈরী (আজমীরে তৈরী এই আতরের নাম ছিল 'জাহাঙ্গীর আতর'), নাচ, গানবাজনায় ব্যস্ত ইত্যাদি বিষয়েরও চিত্র রয়েছে। মোগল *'মুরাক্কা'*র এই সকল বিচ্ছিন্ন খন্ডচিত্রগুলো আমাদের সামনে রাজকীয় মেজাজের বাইরে সাধারণ জনগণের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের একটি উন্নত সংস্করণ।

মোগল চিত্রশালাতে হুমায়ূন হতে জাহাঙ্গীর পর্যন্ত শত শত বিখ্যাত এবং শিক্ষানবিশ চিত্রকরগণ কারখানাতে একত্রে কাজ করেছেন। লক্ষ্যণীয় গুলশান এ্যালবামে পুরুষ চিত্রকরের মতই অন্দরমহলে মহিলা চিত্রকরগণ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার বৈচিত্রতা এবং বৈশিষ্ট্যমন্ডিতা সমকালীন চিত্রশিল্পে কোন ভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। রাজকীয় কর্মকান্ডে ও জাতীয় রাজনীতিতে মোগল মহিয়সী নারীগণ যেমন সরব ভূমিকাতে অবস্থান করতেন তেমনি অন্দরমহলে তাঁদের শিল্পকলার প্রতি অনুরক্ততার পরিচয় এই আমলে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথেই বিবেচিত হচ্ছে। তাঁদের কর্মকান্ড এতটাই কালোত্তীর্ণ ছিল যে রাজকীয় বিশেষ এ্যালবামে সমসাময়িক ধ্রুপদী চিত্রকরগণের কাজের সাথে নারী চিত্রকরগণের দক্ষতা গুলশান এ্যালবামে বাদশাহ মলাট বন্দি করেন।[১৬]

গুলশান এ্যালবামে দুইজন মহিলা শিল্পীর নাম আমরা দেখতে পাই। তাঁদের নাম মার্জিনের 'হাশিয়া' বা (প্রান্তিক নক্সা) মিনিয়েচারের মধ্যে নয় বরং এ্যালবামের পৃষ্ঠার মুখ্যছবির মধ্যে লেখা আছে। এর প্রথম উদাহরণটি হল ১২৭ নং পৃষ্ঠার চারটি ইউরোপীয় ছবির অনুকৃতির একটি সেন্ট জেরোমের। পেত্রুস ক্যানডিভোর ছবির ইয়ান স্যাডলারের করা ছাপচিত্রের উপর অত্যন্ত যত্ন করে উজ্জ্বল রঙ দিয়ে নিপুণ হাতে আঁকা এই ছবিতে সেন্ট জেরোমের হাতের খোলা বইয়ে সূক্ষ অক্ষরে লেখা আছে, 'মীর তকীর কন্যা, রেজার শিষ্য, পাদশাহ্ সেলিমের 'বান্দা' নাদিরা বানুর কাজ'। এই লেখা ও ছবির মাধ্যমে প্রমাণিত হল ইউরোপিয়ান ছাপাই ছবির রঙিন অলংকরণে পুরুষের দক্ষতার সমান্তরালে মেয়েরাও অংশ নিয়েছেন। ছবিটি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে যুবরাজ সেলিম এলাহাবাদে থাকাবস্থায় তাঁকে উৎসর্গ করে তৈরী করা।

গুলশান *মুরাক্কা* তে নাদিরা বানুর অন্য একটি স্বাক্ষরিত ছবির উপস্থিতি রয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠার এই ছবিতে বৃদ্ধ সেন্ট অ্যান্টনি অ্যাবটকে (ছবি নং ৪.৮) দেখানো হয়েছে। তাঁর হাতে মোটা জপমালা, দৃষ্টি দু হাতে ধরা খোলা বইয়ের উপর আবদ্ধ। ছবির নীচের মার্জিনে ছাপছবির প্রিন্টলাইনে চিত্রকর মার্টিন ডি'ভস ও ছাপাইকার ইয়ান স্যাডলারের নামের আদ্যক্ষর JS। তার নীচে দু লাইন লাতিন লেখার তলায় টানা আরবী অক্ষরে লেখা- 'মীর তকীর কন্যা, আগা রিজার শার্গিদ, নাদিরা বানুর কাজ'।[১৭] উল্লেখিত ছবি দুটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল- একরঙা ছাপছবিকে রঙিন ছবিতে রূপান্তর করার সময় মূল ছবির আঙ্গিক, পশ্চাৎভূমি, স্থাপত্য ইত্যাদির বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয়নি। যদিও ছাপছবির কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বাদশাহ আকবরের চিত্রকর কেশবদাশ। লক্ষ্যনীয় যে কেশবদাশের ছবিতে বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রাখা হলেও পারিপার্শ্বিক পশ্চাৎভূমিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই প্রচেষ্টাতে কোন কোন ক্ষেত্রে মনে করা যায় যে তিনি ছাপছবিটিকে পরিপূর্ণভাবে মোগল সৃষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যাই হোক, শিল্পী নাদিরা বানুর আঁকা বহুবর্ণ

৪.৮ সেন্ট অ্যান্টনি অ্যাবট, নাদিরা বানু, গোলেস্তা গ্রন্থাগার, তেহরান, ১৬০০-১৬০১ খ্রি:

ছবি দুটি একই পর্যায়ভূক্ত নয়, তবুও তার কাছে নিতান্ত অপরিচিত দুটি আলাদা চরিত্রকে যেভাবে প্রাণবন্ত ও দৈবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে তাতে একজন অপেশাদার জেনানামহলের পর্দানশিন মহিলার নিকট আদতেই প্রত্যাশিত নয়।

৪.৯ পারসিক যুবক, রোকেয়া বানু, গোলেস্তা গ্রন্থাগার, তেহরান, ১৬০০-১৬০১ খ্রি:

গুলশান এ্যালবামের সংরক্ষিত একটি ছবি তেহরানের গোলেস্তা রাজপ্রাসাদের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। একটি পৃষ্ঠাতে তিনটি ছবি ভিন্ন চরিত্র নিয়ে অংকীত আছে। ছবির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটা আবছা হালকা রঙে কিছুটা ইউরোপীয় রৈখিক পদ্ধতিতে পেন্সিলে আঁকা স্কেচ এর মত করে চিত্রিত। রৈখিক পদ্ধতিতে মুসলিম চিত্রকরদের আঁকা ছবির সন্ধান আমরা পাই ১৬ শতকে পারস্য রাজদরবারের বিখ্যাত চিত্রকর রেজা আব্বাসীর একটি চিত্রে। শিল্পী একজন পারস্য তরুণের অনবদ্য প্রতিকৃতি হালকা রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। আলোচিত এই ছবিটি মোগল চিত্রশিল্পী রোকেয়া বানু কর্তৃক রেজা-আব্বাসীর অনুকরণে আঁকা পারসিক একজন যুবকের ছবি (ছবি নং ৪.৯)।[১৮] অত্যন্ত ঢিলে ঢালা পোশাকে উপবিষ্ট একজন তরুন যুবক যার সম্মুখে একটি পাত্র। ভারতীয় শিল্পীদের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে ব্যবহৃত কোমের গিরো দেয়া অতিরিক্ত একটি কাপড় এবং তার অনুকরণে মাথাতে একই ধরণের কাপড়ের পারসিক ধাচেঁ পরিহিত পাগড়ী। বসার স্থানটি একটি ফুল বাগানের অমসৃন স্থান। আর আকাশকে একই পদ্ধতিতে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। এ্যালবামের একটি পাতাতে ব্রাকেটের মধ্যে মোটি তিনটি ছবির অস্তিত্ব রয়েছে। চিরাচরিত পদ্ধতিতে ব্রাকেট বা পাড় ফুল ও বহু রঙের লতাগুল্ম দ্বারা শোভিত।

আরও একটি ছবির কথা বলা যায় যার চিত্রকর নিনি। ছবির বিষয়বস্তু খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ক এবং ইউরোপের বিখ্যাত ছাপচিত্রকর জেরোম ওয়ারিকস এর 'মার্টারডাম অফ্ সেন্ট সিসিলিয়া'র অনুকরণে তৈরী। শিল্পী নিনি এই অতি মূল্যবান ছবিটি উজ্জ্বল আকর্ষণীয় বহুরঙে ছবিটি এঁকেছেন। চিত্র সমালোচক অনেকেই শিল্পী নিনিকে অমোগল শিল্পী হিসেবে মনে করেন। কেননা উল্লেখিত নামটি মুসলিম অথবা স্থানীয় ভারতীয় নামের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকটাই অনুপস্থিত। তবে ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনামল হতে প্রচুর ইউরোপীয় দরবারে আসেন এবং স্থানীয় সংস্কৃতিতে নিজেদের ঋদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। ধারণা করা হয় অন-আর্মেনিয় এই মহিলা তাদেরই একজন। সুতরাং অভারতীয় শিল্পীদের মাধ্যমেও যে মোগল দরবারে চিত্র অংকন করা হোত তারও একটি প্রমাণ এই চিত্রটি।

'মুরাক্কা-ই-গুলশানের' এই ছবিটি 'ওয়ান্টেজ এ্যালবামে' সংযুক্ত আছে যা বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বাদশাহ শাহজাহান তাঁর কিশোর বয়স হোতেই পিতার চিত্রশালাতে আসক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সংগ্রহগুলোতেও তিনি এ্যালবাম তৈরী করেন। গুলশান *'মুরাক্কা'*র অনুকরণে তিনিও অনেক একক ছবি চিত্রায়ণ করান। শাহাজাহানের এই সকল সংগ্রহ এ্যালবাম অথবা বিচ্ছিন্নভাবে মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম, নিউ ইয়র্ক, ফ্রিয়ার গ্যালারী ওয়াশিংটন, চেষ্টারবেটি মিউজিয়াম ডাবলিন ও জয়পুরের সওয়াই মানসিং দ্বিতীয় সংগ্রহশালা সহ অনেক যায়গাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ছবিটিতে মূল জমিনটি বহুরঙা ফুলের উপর স্থাপিত। এরই উপর নীচের দিকে শিল্পী নিনির নাম লেখা রয়েছে। মূল কাগজের প্রথম ব্রাকেটটি চলমান একটি একরঙা বন্ধনী যার ভেতরে হাশিয়াকে ঘিরে আছে দ্বিতীয় বন্ধনী। অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙে ফুলেল নকসাতে এই বন্ধনিটি সজ্জিত। আর চিত্রে হাশিয়ার যে ব্যবহার তার পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে হস্তলিখনের এই তৃতীয় বন্ধনিতে। ছবির মূল চিত্রায়ন কে ঘিরে আছে উপরে ও নীচে অপেক্ষাকৃত মোটা বর্ণনা সম্বলিত হাশিয়া। এখানে ছবি এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া রয়েছে। আমরা জানি ছবির হাশিয়াতে ব্যবহৃত হস্তলিখনের মধ্যে শাসকের জন্ম ও মৃত্যু সাল, শাসকের কীর্তি, চিত্রকরের জীবনালেখ্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর হাশিয়ার মধ্যেই নিনি তাঁর ছবিতে একজন অন্তস্বত্ত্বা মাকে একজন ধাত্রী/ চিকিৎসক ঘাড়ের পেছনের দিকে ডান হাত দিয়ে কিসের যেন উপস্থিতি লক্ষ্য করছেন। অন্য হাতে মহিলার শরীরের উপরের ব্যবহৃত অংশের ওড়না ধরে আছেন। পাশে অর্ধ উপবিষ্ট অন্য একজন মহিলা একটি পাত্রে তরল জিনিষ নিয়ে ধাত্রী/ চিকিৎসককে সহযোগিতা

করছেন।[১৯] উল্লেখিত তিনজন মহিলার পোষাক ঢিলে ঢালা ও পারসিক ধাচের। ছবির উপরে খ্রিষ্টের পৌরাণিক কাহিনীর ন্যায় দুজন দূত এই দৃশ্য অবলোকন করছেন। এই দুইজন যে স্বর্গীয় দূত তা বোঝাতে একজনের কাধ বরাবর পেখম সংযুক্ত রয়েছে এবং অন্যজন রহস্যময় উর্ধলোক থেকে ভেষে ভেসে আসছেন (ছবি নং ৪.১০)। উল্লেখিত চরিত্রদ্বয় ইউরোপীয় চিত্রে প্রায়শই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পুরো ছবিতে ভারতীয় ধাচে উজ্জ্বল ও গাঢ় রঙের পাশাপাশি পোশাক পরিচ্ছদে হালকা মোলায়েম রঙ এবং অতি উজ্জ্বল স্বর্ণের তরল রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। ফুলেল জমিনে শিল্পীর যে লেখা নাম তা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিজ হাতে লেখা।

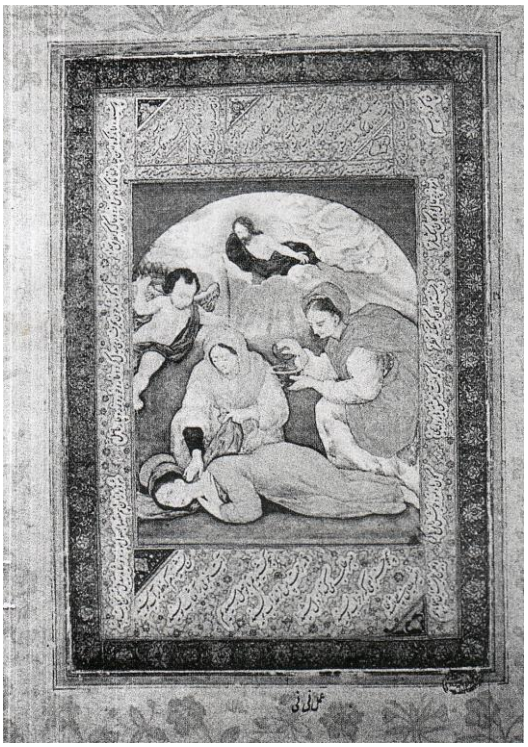

৪.১০ মর্টারডাম অফ সেন্ট সিসিলিয়া, নিনি, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন, ১৬০০-০৫ খ্রি:

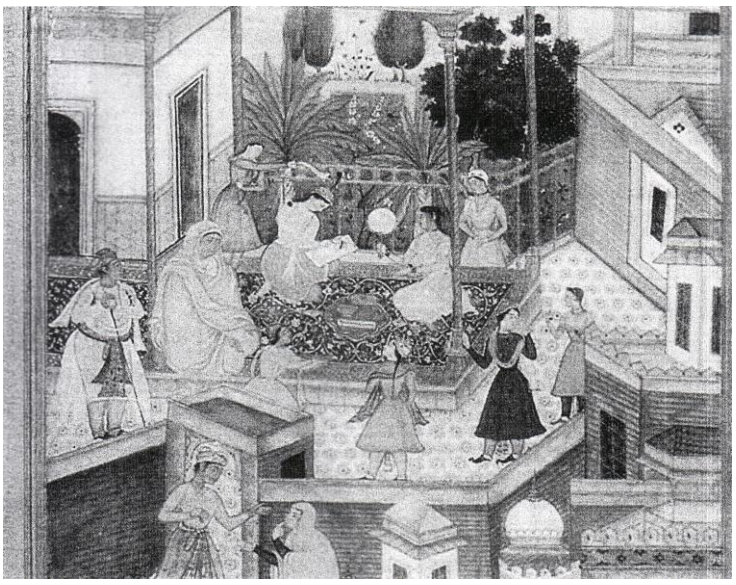

৪.১১ রুশ রাজকন্যা, জগন্নাথ, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন, ১৫৯৬ খ্রি:

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় শিল্পী জগন্নাথ এর চিত্রায়িত 'রুশ রাজকন্যা' ছবিটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ছবি নং ৪.১১)। বৃটিশ লাইব্রেরী লন্ডনে রক্ষিত এই ধরণের আঁকা অপর একটি ছবির সংগ্রহ রয়েছে। তবে সে ক্ষেত্রে ছবি দুটির তেমন কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না। বাদশাহ বাবরের কন্যা গুলবদন তাঁর বাবা ও ভাইয়ের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ যে বর্ণনা তাঁর 'হুমায়ূননামা'তে তুলে ধরেছেন সেখানে রাজ অন্তপুরে মহিলা শিল্পীদের দিয়ে এ্যালবাম বা বিচ্ছিন্ন ছবি আঁকার প্রমাণ রয়েছে। বাদশাহ আকবরের রাজত্যের শেষ দিকে 'খামসা'তে নিজামীর পুঁথির একটি

ছবিতে 'ওয়াসলির' উপর কাগজ লাগিয়ে আত্ব প্রতিকৃতি তৈরীতে মগ্ন একজন রুশ দেশের রাজকন্যাকে মহলের ভিতরে ছবি আঁকাতে নিমগ্ন দেখা যাচ্ছে। রাজকন্যার সম্মুখে একজন গৃহপরিচারিকা একটি আয়না হাতে উপবিষ্ট আছেন। অদূরেই একজন মধ্যবয়সী অভিভাবক মহিলাকে স্থির ভাবে বসে সে দৃশ্য দেখতে দেখা যাচ্ছে আরও কয়েকজন মহিলা কর্মচারিকে তাদেরকে পরিবেষ্টন পাহারারত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আর গুপ্তচররা এই শাহজাদিকে বিয়ের জন্য তাঁর বাবার দেয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে সেগুলো শুনতে উদগ্রীব হয়ে আছে। অনুরুপ অন্য একটি ছবি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবেন রক্ষিত আছে। যে ছবিতে একজন মহিলা শিল্পী অন্দরমহলের উঠানে অপর এক মহিলার ছবি আঁকতে দেখা যাচ্ছে। ছবিটি যখন প্রকাশ করা হয় তখন জাহাঙ্গীরের আগ্রহেই ছবিটি তৈরী হয়েছিল বলে ধরে নেয়া হয়।[২০] শিল্পী জগন্নাথ ও চিতোরনের আঁকা চিত্র দুটি অনবদ্য ও পারিপার্শিক পরিপাটি ব্যবস্থাপনায় আঁকা হয়েছে। প্রথম ছবিতে স্থাপত্য, ঝাউগাছ, খেজুর গাছ ও ভারতীয় পরিবেশের অন্য একটি বাহারি গাছের মাধ্যমে অন্দরমহলের ভেতরকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। রুশ কন্যার ব্যবহৃত অলংকার, দেহ বৈশিষ্ট্য, উপবেশনের ঢং ও ব্যবহৃত পোষাক অন্য সব ব্যক্তি স্বত্তা থেকে তাকে আলাদা করেছে। ছবিতে ভারতীয় প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা না করে ইউরোপীয় আবহ সংযোজিত হয়েছে। আর রঙের ব্যবহারে পারস্য ও ভারতীয় অতি ব্যবহৃত রং সমূহের সমাবেশ ঘটিয়ে স্থাপত্য ও পোশাকে গাঢ় রঙের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়।

আলোচিত 'মুরাক্কা-ই-গুলশান' এ্যালবামের বিস্তারিত ও বৈশিষ্ট্যগত বর্ণনার পর এটার শিল্পবোধের প্রতি পাঠকের দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করে। এর চিত্র শৈলী, বিষয় বস্তুর নির্বাচন, কোন পুণ্যব্যক্তির চিত্রার্পিত, এক পৃষ্ঠায় নম্বরযুক্ত কাগজ বা একটি কাগজকে ভাল করে ২/৪ অংশে বিভক্ত করে তাতে অংকীত চিত্র সকল কিছুই দৃষ্টিনন্দিত ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বলেই প্রমাণিত। চিত্রকরের এহেন কাজকে তাঁর নিজের কাজের প্রতি দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করে। আমরা অবগত আছি যে, মোগল চিত্রকলা হোল পারস্য চিত্ররীতির সংশ্লেষণ দ্বারা উৎপন্ন একটি কৌশল যা বাদশাহ বাবুর মধ্য এশিয়া হতে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন এবং পরবর্তীতে ভারতীয় রীতিকৌশল দ্বারা স্থানীয়দের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। অধিকন্তু সুফি মতাদর্শ মোঘল চিত্রকলাকে পারস্য ও ইসলামি ভাবধারাতে পূণরাবৃত্তি ঘটায়। পরবর্তীতে মোগল ঘরানা থেকে রাজ্য ক্ষমতার ক্রমাবনতিতে এবং ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এতে ইউরোপিয় বাস্তববাদ এখানে ফুটে ওঠে।

এই বিশ্লেষণে আমরা একটি মতামতে একত্রিত হতে পারি যা মার্শাল (Marshall) কর্তৃক আরোপিত। এখানে 'কবি ও যুবরাজের' (ছবি নং ৪.১২) ছবিতে রাজকীয় চিত্রকর আকবরি আমলের বৈশিষ্ট্যকে তুলে এনেছেন। চিত্রকর লাল গাছপালা ও পাথরের যে চিত্রায়ন করেছেন তার সাথে এর অনেক মিল পরিলক্ষিত হয়। চিত্রের বৃদ্ধ লোকের যে মুখাবয়ব তা হয়ত অন্য কোন চিত্রকর চিত্রণ করেছেন। আর এই সময় চিত্রকর মনোহর দৃষ্টি কাড়া প্রতিকৃতি তৈরী করে সকলের নজর কাড়েন বিশেষত শেখ সাদীর পান্ডুলিপিতে।

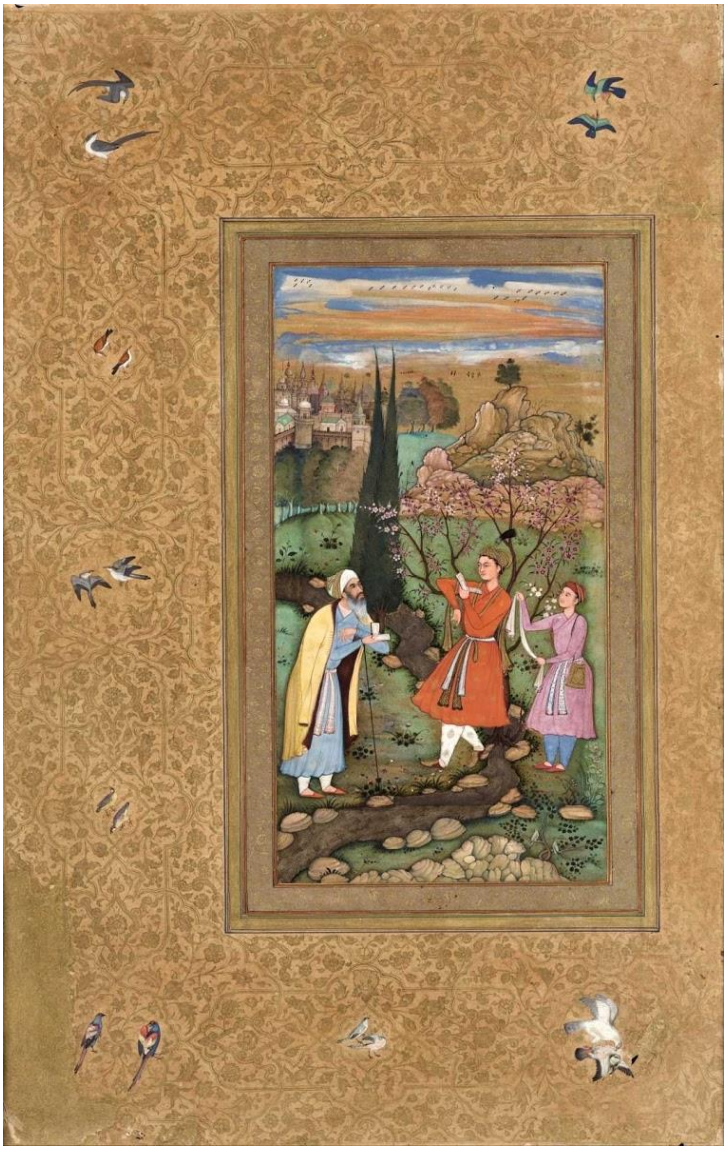

৪.১২ কবি ও যুবরাজ, মুরাক্কা ই গুলশান, বিচিত্রন, গোলেস্তা গ্রন্থাগার, ১৬২০ খ্রি:

আর মরিশ (Morish) এর বিভাজন মত দেন- চেলা'র (Chela) কাজটি তিনটি পর্যায়ে 'মহিষের সিংহ শিকার' এর দৃশ্যটি তার প্রাথমিক কাজগুলোর অন্তর্গত। শিল্পরসিক মাইলো বিচ এর মতে- দুইটি চিত্রকে একত্রে চিত্রায়ণের যে দৃশ্য এ্যালবামটিতে যেখানে 'শিকলে বাধা হাতিটির' চিত্রকর ফররুখ চেলা। এখানে চিত্র অংকনের রীতি, কোনযুক্ত অথবা নমনীয়তাহীন বিষয়বস্তু এবং রঙের ব্যবহারে সমন্বয় করা হয়েছে উভয় ছবিতেই। উভয় চিত্রে দৃষ্টিনন্দিত 'হাশিয়া'র ঐক্যতা ছবিটির স্থানিক বিবেচনাতেও পরিপুরক।

এখানে এ্যালবামের ব্যবহৃত বর্ডার ও হাশিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো বিষদভাবে আলোচনার দাবীদার। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়, এ্যালবামের অংকীত প্রতিকৃতি/ ছবিগুলোতে বর্ডারের যে বৃদ্ধিকরন করা হয়েছে বিশেষত 'হাশিয়া'য় মধ্যে প্রকৃতিঘেষা বাস্তবধর্মী পাখির ও বিভিন্ন বস্তুর ছবির ব্যবহার দেখা যায় তা কেবলমাত্র বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পশু পাখি ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর মমত্ববোধের কারনে হয়েছিল। মোগল শাসকদের এই রীতি বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীর এর সময় পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত ছিল। আর জাহাঙ্গীরের পরবর্তীতে এই 'হাশিয়া' ও বর্ডারের অলংকার মূল্যবান ও বর্ণনামূলক প্রসঙ্গ হিসেবে মোগল *মুরাক্কা* তে স্থান করে নেয়। সুফী মতাদর্শের প্রতিফলন ও ঘটে এই বর্ণনা ও সম্পর্ক সৃষ্টির মধ্যে।

'মুরাক্কা' টিতে যে প্রায়োগকি বিশ্লেষণ তার মধ্যে ফলিও (folio) সৃষ্টি এবং যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তা সম্পর্কে বলা দরকার। প্রতিকৃতিগুলোতে ব্যবহৃত রঙ এর ক্ষেত্রে যে হলুদ রঙের ব্যবহার তা আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় হলুদ রঙের প্রয়োগ লক্ষ্যনীয় যেখানে এর উজ্জ্বলতা ও গভীরতা তৈরীতে রাজকীয় মোগল শিল্পীগণ গোমুত্র সব সময় অনুসঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতেন না। একইভাবে গাঢ় নীল রঙে র (vibrant blue) ব্যবহার করা ল্যাপিস লাজুলি (lapis lazuli) অর্থাৎ গাঢ় নীল বর্ণের প্রস্তর মত উজ্জ্বলতা আনতোনা ফলে চিত্রকরগণ তা আকাশী রঙের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। আর ল্যাপিস (Lapis) ব্যবহৃত হোত ছবি আলোকিত করার কারণে। রঙের ব্যবহারের সাথে বর্ডার তৈরীর প্রক্রিয়া ছবিটিকে আরও বেশী প্রকাশ করত। রঙ্গীন কাপড়ের লম্বা সরু ফালি প্রথমত কেন্দ্রীয় চিত্রটির চতুর্দিকে দেয়া থাকত এবং অনেক সময় তা বর্ধিত থাকত যা আমরা "কবি ও যুবরাজের" ছবিটিতে লক্ষ্য করি। এর চারিদিকের যে ফুলেল নকসা তা স্বর্ণের আস্তরণ দ্বারা শোভিত। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে স্বর্নের গুড়ো (আফসান) বর্ডার ও হাশিয়াতে আঠার উপর ছিটিয়ে দেওয়া হতো যাতে সেটি অনেকদিন টিকে থাকে । আবার অনেক সময় পুরানো কাপড়ের লম্বা সরু ফালি অন্য কোন পান্ডুলিপি হতে অনুকরণ করে নতুন ভাবে তাতে প্রাণ সঞ্চালন করা হোত।

বস্তুত গুলশান *মুরাক্কা* তে ব্যবহৃত কলাকৌশল ও আনুসাঙ্গীক বস্তুগুলো কেবলমাত্র মোগলদের মাধ্যমেই ব্যবহৃত হয় যেখানে শিল্পী কলাকুশলী একসাথে কাজ করেছেন পৃষ্ঠপোষক রাজকুমার সেলিমের নির্দেশে (পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীর)। তাই এই *'মুরাক্কা'* টি কেবল মাত্র মোগলদের শিল্প কৌশলের চরম পরাকাষ্ঠা নয় অধিকন্তু বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শৈল্পীক ও নান্দনীক দৃষ্টিভঙ্গীর এক অনন্য স্বারক। 'কবি ও যুবরাজ' (The Poet and the Prince) ছবিটিতে একজন তরুণ যুবরাজ একটি বই আকড়ে ধরে আছেন। তিনি পুস্পমুকুল সমৃদ্ধ একটি গাছের নীচে দাড়িয়ে শিক্ষা গ্রহন করছেন। গাছের ফুলের রঙ

গোলাপী। যুবরাজের সহকারী তার সামনে দাড়িয়ে আছে একটি স্কার্ফ (Scarf) হাতে। যুবকটি মোগল ঐতিহ্যের পোষাক পরিধান করে আছেন এবং তাঁর মাথায় মোগল সাদৃশ্য পাগড়ী। যুবকের সম্মুখে একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন যিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং তিনি পারসিক পোষাকে ও তাঁর মস্তকে পারস্যিক ধাঁচের পাগড়ী শোভা পাচ্ছে। তিনি চোলা পরিহিত যা তার হস্তদ্বয়কে আবৃত করে আছে। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি একটি ধর্মীয় পুস্তক হাতে দাড়িয়ে আছেন সুফী সাধকদের মতো করে। তার অভিব্যক্তি কঠোর তপশ্চর্যাপূর্ণ, আধ্যাতিক শক্তি সম্পন্ন এবং স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যুবরাজের প্রতি। পাণ্ডুলিপির চিত্রায়িত পারস্য কবি এবং সুফি ভাবাদর্শ জাহাঙ্গীরের দার্শনিক চিন্তার অভিব্যক্তি। বিষয়টি এমন যে বাদশাহ ও তাঁর সহকর্মী খুব গর্ববোধ করছেন তাদের পারস্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কাব্যিক ছন্দের জন্য এবং যেখানে শিল্পী মোগলদের আভিজাত্য ও বদান্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছে পুরো চিত্রটিতে। প্রতিকৃতিটিতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের চিত্রকলার প্রতি যে ঐশ্বরিক নম্রতা প্রকাশিত হয়েছে তার চিত্রকর হোলেন চিত্রশিল্পী বিচিত্র (Bitchtr)। চিত্রকর যথার্থই বাদশাহের সুফীবাদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা কেবল ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস (James 1) ও অটোমান সুলতানদের সাথে তুলনীয়। বস্তুত সুফিগণ হলেন শ্রদ্ধেয়, তাদের সঙ্গ সম্মানীয়, তাদের উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান যেমনটা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয় তার সাদৃশ্য (Sufis were revered and their company honoured, their advice was valuable as they were considered akin to God)[২১] জাহাঙ্গীরের এই মনোভাব তাঁর পিতা বাদশাহ আকবরের সময়কাল হতে উৎসারিত। কেননা, আকবর অত্যন্ত নিবেদিত মনে ধর্মের নিগুঢ় রহস্য উন্মোচনে অনেক জাতি-ধর্ম, মতাদর্শের সাধকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। এই সকল সাধকগন তার 'ইবাদতখানা'তে আসতেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে পর্যালোচনা করতেন। এই প্রক্রিয়াটি জাহাঙ্গীরকে গোঢ়া ধর্মানুসারী হতে বাধা দেয় এবং ইসলামের সরলতাকে আঁকড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। ফলে তিনি ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থ খোজার মাধ্যমে সত্যকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সুফী মতাদর্শকে লালন করতেন।

আমরা জানি মোগল চিত্রকলা চরিত্রগত দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ। চিত্রকলাতে শাসকদের শক্তিমত্তা ও জীবনের ক্ষণস্থায়ী বিনোদনের জন্য যেখানে তাদের অদেখা ভূবনের প্রতি আধ্যাতিক প্রেমকে ফুটিয়ে তোলে। ফলে সুফীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী ও তাদেরকে রাজকোষ হতে অর্থ প্রদান ইত্যাদি বিষয় শাসকদের চিত্রকলার বিষয়বস্তু হিসেবে পছন্দনীয় ছিল। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত 'জাহাঙ্গীরনামা'তে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর ১৩ শতকের বিখ্যাত পারস্য কবি শেখ সাদীর কবিতার প্রতি যারপরনেই দূর্বল ছিলেন। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে অংকীত একটি চিত্রে ১১০ বৎসরের বৃদ্ধ সাদীকে তার কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে বের

করে এনে অংকন করা হয়েছে যেখানে তিনি একটা চোলা (Chola) পরিহিত এবং হাটু গেড়ে বয়সের ভারে নুয়ে আছেন।

(খ) 'মুরাক্কা-ই-গুলিস্তান'

পারস্য কবি ও লেখক শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রী:) ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাঁর অমর কাব্য গ্রন্থ 'গুলিস্তান' রচনা করেন । মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাসে এই গ্রন্থটি একটি অমূল্য সম্পদ । ১৪২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাইসানগুর হেরাতে তাঁর লিপি শিক্ষক শামস-উদ্দীন এর তত্ত্বাবধানে এর পান্ডুলিপিটি চিত্রায়ন করেন । এর সাতটি চিত্র সম্বলিত সংকলনটি বর্তমানে ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী তাত্তি এবং আটটি চিত্রের সংকলনটি ডাবলিনের চেষ্টারবেটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[২২]

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত *'মুরাক্কা'* র ২য় সংগ্রহটি এই 'মুরাক্কা-ই-গুলিস্তান' যা বর্তমানে বার্লিনে জার্মান জাতীয় লাইব্রেরিতে ও কিছু চিত্র প্যারিসের মিউজে গিমে এবং লন্ডনের চেষ্টারবেটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এগুলো চিত্রনের সময়কাল ১৬০৮-১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ ও ছবির পরিমাপ ৪০ x ২৪ সে.মি. । সংগৃহীত ছবির সংখ্যা ২৫টি । চিত্রিত প্রতিকৃতির মধ্যে জাহাঙ্গীরের সভাসদ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, শিল্পী, লিপিকার, মহিলা, ইউরোপিয় ফ্লেমিশ এবং জার্মান সহ দক্ষিণ ভারতীয় কিছু ছবি রয়েছে । প্রতিকৃতিগুলো বিশনদাস, মনোহর, বালাচান্দ, গোবর্ধন এবং আবুল হাসানের আকাঁ এবং এগুলোর ক্যালিগ্রাফার মীর আলী, ও সুলতান আলী মাশহাদী ।[২৩] তবে এই *'মুরাক্কা'* টি নিয়ে তেমন কোন বিস্তারিত তথ্য মেলেনি ।

(গ) অপরাপার এ্যালবামের আলোচনা

মিন্টো এ্যালবাম, ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড (Dublin, Ireland)

দি চেষ্টারবেটি লাইব্রেরী, ডাবলীন, সংগ্রহ তারিখ- ১৬১২-৪০ খ্রিষ্টাব্দ, যাদুঘর সনাক্তকরণ নম্বর CBL In 07A পরিমাপ- ৩৮:৯×২৭.২ সেন্টিমিটার ।

মিন্টো এ্যালবামটি বর্তমানে খোলা অবস্তায় ৪০টি ছবির সমন্বয়। এর মধ্যে চেষ্টারবেটি লাইব্রেরীতে ১৯টি এবং ভিক্টোটিয়া এন্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে (Victoria and Albert Museum, London) এ আছে ২১টি খোলা পাতা। আবার খোলা পাতাগুলোকে একত্রিত করে ওয়ানটেজ এ্যালবাম (Wantage

Album) যা ভিক্টোরিয়া এন্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডনে সংরক্ষিত আছে। অনুরুপভাবে ক্যাভারকিয়ান এ্যালবাম মূলত মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে রক্ষিত থাকলেও তার কয়েকটি পাতা আবার ফ্রিয়ার গ্যালারিতে (Freer Gallery of Art) আছে। বস্তুত এই ফলিও গুলো ধারণা করা হয়ে থাকে যে- কোন বিশেষ বিষয়ের উপর লিখিত রচনা সমূহের সংগ্রহের অবশিষ্ট যা মূলত ব্যবহৃত হয়েছিল একটি ধারাবাহিক ও সংশ্লিষ্ট এ্যালবাম তৈরীর উদ্দেশ্যে। এর সময়কালের বিষয়ে কিছুটা এলোমেলো অবস্থা রয়েছে। কেননা এই কাজটি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নির্দেশে শুরু হোলেও বাদশাহ শাহজাহান এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

৪.১৩ গ্লোব হাতে জাহাঙ্গীর, মুরাদ জাদা, সদবি বিক্রয় সংগ্রহ, সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ

ছবিগুলো মূলত রাজন্যবর্গ ও রাজকীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বর্গের দাড়ানো অবস্থায় নিঁখুত ও মনোমুগ্ধকর চিত্রকর্ম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- বাদশাহ জাহাঙ্গীর একটি গ্লোব ধরে আছেন (ছবি নং ৪.১৩), বাদশাহ শাহজাহান একটি কমলালেবু বর্ণের ঢিলে ঢালা জামা পরিহিত অবস্থায়, শাহজাহান এবং তাঁর পুত্র, খাজা মুঈন-উদ্দিন-চিশ্‌তী যিনি মোগলদের আধ্যাত্বিক পথ প্রদর্শক ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ যার বিবরণ মোহাম্মাদ রিজা কাশ্মীরি কর্তৃক প্রদত্ত। চিত্রকর্মগুলো ফুলেল নকসা সম্বলিত ‘হাশিয়া’ দ্বারা শোভিত যা গোটা চিত্রকর্মটিকে ঘিরে আছে। এ্যালবামটিতে অনেক ধরণের ছবির সমাবেশ ঘটলেও বাদশাহ ও তার পুত্রদের ছবি, কিছুটা আয়েশি ভঙ্গিতে বাদশাহ ও যুবরাজদের ছবি, বিভিন্ন সভাসদবর্গের ছবি, সঙ্গীতজ্ঞদের ছবি, কঠোর তপশ্চর্যাপূর্ণ গুণি ধর্মীয় ব্যক্তিদের ছবি এবং জীব-জন্তুর ছবি এই *‘মুরাক্কা’* বা এ্যালবামটিকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আর প্রত্যেক প্রতিকৃতির মুখোমুখি পাতাতে পারস্য কবিতার অংশ বিশেষ হস্তলিখনের নিপুন ছোঁয়াতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হস্তলিখনগুলো নি:সন্দেহে ইরানি কলমের লিপিকার মীর আলীর কৃতিত্ব। প্রতিকৃতি ও হস্তলিখনের পাতাগুলো

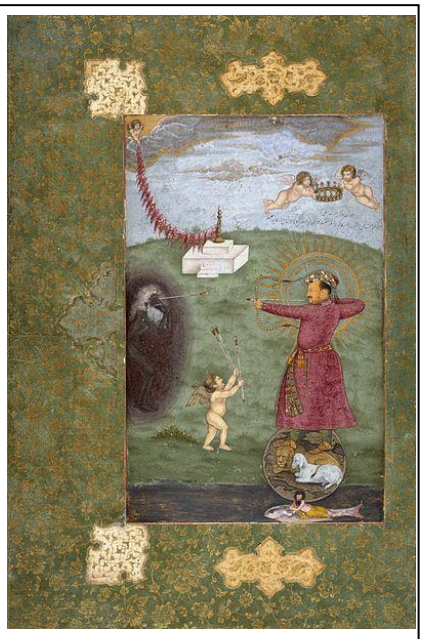

৪.১৪ জাহাঙ্গীরের তীর ছোড়া, আবুল হাসান, সদবি বিক্রয় সংগ্রহ, সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ

যথানিয়মে সুসজ্জিত বর্ডার বা হাশিয়া দ্বারা শোভিত। এ্যালবামের অনেক ছবিতে জাহাঙ্গীর অথবা শাহজাহান পৃথীবির মানচিত্রকে হাতে ধারণ করে আছেন অথবা অধিকতর বড়টির উপর দাড়িয়ে আছেন। এদের মধ্যে একটি বিখ্যাত চিত্র হলো- জাহাঙ্গীর একটি গ্লোবকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং একটি তীর ছুড়ছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দি (ছবি নং ৪.১৪) শাসক মালিক আম্বারের ছিন্ন মস্তকের দিকে। এখানে একটি স্মৃতি জাগানিয়া কাব্যিক ছন্দ লিপিবদ্ধ আছে তা হোল "যেখানেই তুমি মথা নত করে আসবে তাহলে তুমি রঙ চুরি করবে শত্রুর কপোল হতে" (Whenver you come into the bow you steal the colour from the cheeks of enemies)।

এ্যালবামটিতে রাজকীয় উচ্চ পর্যায়ের সফরসঙ্গীগণ রাজপ্রাসাদের বাইরে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে যা মিন্টো এ্যালবামের আলাদা একটি ধারণা। সম্ভবত এটিই একমাত্র উদাহরণ যেখানে ইসলামি ভাবাদর্শের বাগান চিত্রিত হয়েছে পশ্চিমা ধাচের পরিপ্রেক্ষিতে। রঙ্গীন পোষাকে যুবরাজ ও পারিষদবর্গ মদ্যপানরত আছেন আর হাতলছাড়া পানপাত্রগুলো বিশেষ ভেনিসিয় মডেলের। এই পাতাটি বাদশাহ শাহজাহানের সময়কালে তৈরী করা যা প্রকৃতির চাইতেও বাস্তব। আর যে ধরণের পরিধেয় বস্ত্র তা ধার্মিক ব্যক্তির অভিব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন সভাসদ একটি আলখেল্লা পরে আছেন যা আস্তিন বা জামার হাতার সাথে অসংশ্লিষ্ট এবং তার কাধের উপর বাঘের চামড়ার আবৃত করা আত্মনিরোধী বা কঠোর তপশ্চর্যাপূর্ণ একখন্ড বস্ত্র। প্রতিকৃতিটিতে বস্ত্রের যে ব্যবহার করা হয়েছে তার রঙ অত্যন্ত পরিবেশ বান্ধব লাল ও হলুদের বন্ধনে আবদ্ধ যা অন্যান্য *মুরাক্কা* গুলিতে ব্যবহার হয়ে আসছে। ছবিটির মুখবন্ধ লিখেছেন মীর আলী - "As long as the patched cloak of the celestial sphere contains the sun and moon, may this album be the object of your perpetual gaze"।

৪.১৫ গুলশান-ই-তারিখ এর কভার পৃষ্ঠা, গোলেস্তা গ্রন্থাগার, ১৬২৫ খ্রি:

(ঘ) 'গুলশান-ই-তারিখ' (ছবি নং ৪.১৫)

আলোচিত এ্যালবামটির সংগ্রাহক হাকিম আহসান উল্লাহ খান ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও উজির। ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাবর আলী

খানকে সঙ্গে নিয়ে মোগল শাসকদের সম্ভাব্য আত্মীয়, বংশীয় লতিকা সংগ্রহ পূর্বক তাঁদের জন্ম ও মৃত্যু দিনক্ষণ নিশ্চিত করে শাসকদের ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জীর কালানুক্রমিক গ্রন্থনা সন্নিবেশিত করেন যার শিরোনাম দেন 'Portraits of the Exalted Emperors'[২৪] বা মর্যাদাসম্পন্ন মোগল শাসকগণের চিত্র। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, তিনি এই এ্যালবামে তাঁর কার্যটি সংযোজন করেন শাহ আলম দ্বিতীয় এর স্থলে একজন বংশানুক্রমিক তালিকা রচনাকারী হিসেবে। এ্যালবামটিতে মোগল বংশের শাসক বাদশাহ আকবর হতে শুরু করে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত শাসকদের চিত্র রয়েছে। ১৮ শতকের শেষ ও ১৯ শতকের গোড়াতে এই এ্যালবামটি ব্যাপক জনপ্রিয়তার পৌছায়। এর কারণ হলো দুটি। প্রথমত এই সময় প্রচুর পরিমান ইউরোপিয় পরিব্রাজক বিশেষত শিল্প-সংস্কৃতির বোদ্ধাদের আগমন ঘটে এবং তাদের মাধ্যমে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। আর দ্বিতীয়ত এই সময় ইংরেজ শাসকগণের মধ্যে স্মৃতিচারণে অর্থাৎ পূর্ববর্তী শাসকগণের জীবনালেখ্য জানতে এবং তদনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হন। যাই হোক এই এ্যালবামটি মোগলদের সময়ের ক্ষমতা, সাজসজ্জা, প্রণোদনা এমনকি সামরিক কৌশল সম্পর্কীত চিত্র দ্বারা শোভিত। তৈমুরের ঘর হতে একদা যে রাজ্য শাসনের ঢেউ উঠে কালক্রমে তা এসে পড়ে দিল্লীতে । ফলে মোগলদের দ্বারাই এখানকার নগর সভ্যতায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস পরিবর্তিত হয়ে দিল্লী সভ্য নগরে পরিণত হয়।

'*মুরাক্কা*' এমন একটি চিত্রকর্মের সংগ্রহ যেখানে সাহিত্য ও চিত্রের সমন্বয়ে তৈরী এ্যালবাম। এই এ্যালবামগুলো মোগল ইতিহাসের গৌরচবাণ্বিত অংশ। মোগল '*মুরাক্কা*' শাসকদের তৈরী চিত্রের সংগ্রহ যার সূত্রপাত আমীর তৈমুর (১৩৭০ খ্রি.) থেকে বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত যিনি বৃটিশ সৈন্য দ্বারা ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন। এদের মধ্যে আমীরে তৈমুর ব্যতীত সকলেই ভারতবর্ষে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৩৩৩ বৎসর (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রি.) পর্যন্ত শাসন করেন।

৪.১৬ ফররুখ শিয়ার, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৭৩০ খ্রি:

আলোচিত এ্যালবামের ১৬টি এক পৃষ্ঠায় অংকিত চিত্র সম্বলিত '*মুরাক্কা*'টি বর্ণিত তথ্য সমূহ সম্বলিত : (ছবি নং ৪.১৬)

(১) ১৬টি রঙ্গীন প্রতিকৃতি।

(২) তারিখ (ক) জন্ম (খ) ক্ষমতারোহন এবং (গ) প্রত্যেক শাসকের মৃত্যু

(৩) ফারসী ভাষাতে কাব্যিক কালানুক্রমিক বর্ণনা (উল্লিখিত ৩টি তারিখের)

এই '*মুরাক্কা'*র কিছু স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিম্নরূপ-

(ক) মূল অংকিত প্রতিকৃতি যেখানে শাসকের রাজকীয় আভিজাত্যকে তুলে ধরে

এই *'মুরাক্কা'*টিতে তুলে ধরা হয়েছে শাসকদের যে পোষাক সেখানে যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে সেই সময়কার মানদন্ড । উদাহরণ স্বরুপ, এখানে অংকিত তৈমুর, বাবুর, হুমায়ূন এবং আকবরের প্রতিকৃতিতে পরিহিত পোশাকে আত্মাভিমানশূন্য বেশে রাজকীয় মনোভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মাথার মুকুট, প্রভামন্ডল (halo) পদমর্যাদাশুচক পোষাক, অলংকারাদী, জুতা ইত্যাদি অত্যন্ত সাধারণ এবং নিরাভরন। আর দ্বিতীয়ত তাদের রাজকীয় সিংহাসন যেখানে শাসকগণ বসা অবস্থায় চিত্রিত হয়েছেন অত্যন্ত সাধারণভাবে। অধিকন্তু তৈমুর ও বাবুরকে দেখানো হয়েছে বসে আছেন যেখানে তাদেরকে কোন ভাবেই সিংহাসনে বসে আছেন মনে হচ্ছে না। তাঁদের প্রতিকৃতির পেছনের দিকটি খুব বেশী সুনির্মিত অথবা চাকচিক্যময় নয়। পরবর্তী শাসকগণ বিশেষত জাহাঙ্গীর এবং তৎপরবর্তি অর্থাৎ আওরঙজেবের পর প্রতিকৃতিগুলো আড়ম্বরপূর্ণ, সাজসজ্জা এবং সুনির্মিত নিকটসাদৃশ্য। সম্ভবত: এই চিত্রায়ণের একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে, রাজকীয় গাম্ভীর্যতার বিদায়ে পূর্ব জৌলুস ও আভিজাত্যকে জনসম্মুখে বুঝিয়ে দেওয়া। আর মূল প্রতিকৃতিকে ঘিরে যে সকল সভাসদদের ও পরিচারকদের প্রতিকৃতি অংকীত হত তাতে সমসাময়িক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলে অত্যন্ত সাদামাটা পোশাক দেখা যায়। প্রকৃত অর্থে এটাই ঘটনার বাস্তবতা।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল এই যে, *'মুরাক্কা'*য় ব্যবহৃত তারিখ সমূহ যেমন- জন্ম, ক্ষমতারোহন এবং মৃত্যুর তারিখ সমূহ প্রকাশের উদ্দেশ্য হোল- নির্দিষ্ট শাসকের মহনুভবতার ও দাপটের ক্ষণগুলো মনে করিয়ে দেয়া। অনেক ক্ষেত্রে শাসকদের জন্মের স্থান, ক্ষমতা গ্রহণের স্থান এবং মৃত্যুর পরে সমাহিত থাকার স্থানটিও নির্দেশিত থাকতো। এই সকল তথ্য ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান বলে বিবেচিত হয়। যাই হোক, অনেক দিন ক্ষণ মূল ইতিহাসের সাথে অসামঞ্জস্য হোলেও মধ্যযুগের এই ইতিহাসের তথ্যগুলো আবেগ নির্ভর।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হোল- কোন শাসক বা ব্যক্তির তার পদমর্যাদার প্রতীকরূপে স্বীকৃত বস্তু যেখানে তার বংশতালিকার পরিচয় লিখিত থাকে। এগুলো সাধারণত ফারসী ভাষাতে ছোট ছোট পদ্য বা ছন্দ আকারে লিপিবদ্ধ হোত। আর বংশলতিকা (geneology) এমন একটি আদেশ অথবা পাথরে খোদিত কিংবা মুদ্রা বা পদকে অঙ্কিত শব্দাবলী যা নির্দিষ্ট পত্র যেখানে সংখ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যা থাকে এবং একটি বিশেষ সংখ্যার দিকে ধাবিত করে। আলোচিত *মুরাক্কা*'তে ব্যবহৃত বংশলতিকা দুইভাবে কাজ করেছে। প্রথমত এটা ঐতিহাসিক তথ্যকে উপস্থাপিত করেছে অত্যন্ত স্বল্প

পরিসরে এবং দ্বিতীয়ত এটি একটি বর্ণনাকারীর কাব্যিক ধীশক্তি । এখন দুই ধরণের উদাহরণ কেন দেওয়া হোল তার একটি সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া গেল।

(১). হুমায়ূনের কালানুক্রমিক বর্ণনা :

ঐতিহাসিক ভাবে লিপিবদ্ধ যে, বাদশাহ হুমায়ূন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে দিল্লীতে তাঁর রাজকীয় লাইব্রেরীর সিড়ি হতে পড়ে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই মৃত্যুকে স্মরণ করে একজন কবি তার কাব্যিক অভিব্যক্তি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "Humayun Padshah az bam uftad" অর্থাৎ বাদশাহ হুমায়ুন আজ ছাদ হতে পড়ে গেলেন। উল্লেখিত কবিতার লাইনের মাধ্যমে হুমায়ুনের মৃত্যুর আসল ঘটনা বর্ণনা যেমন করা হয়েছে তেমনিভাবে সংখ্যাতাত্বিক হিসেবে ৯৬২ হিজরী সালকেও তুলে ধরা হয়েছে।

(২). *'মুরাক্কা'* টিতে বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের রাজত্বের ইতিহাস (ছবি নং ৪.১৭) বর্ণনা করা হয়েছে দুইটি শব্দের মাধ্যমে। আর শব্দ দুটি হোল- Chiragh Delhi যার অর্থ দাড়ায় দিল্লীর আলো। আর এর সংখ্যা তাত্ত্বিক মূল্যমান হোল ১২৫৩ হিজরী এবং ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ যখন তিনি ক্ষমতাতে আরোহন করেন। আলোচিত এ্যালবামটির শিরোনাম পৃষ্ঠাতে হস্তলিখনের যে অংশটি তাতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াদির তথ্য সমূহ তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হোল।

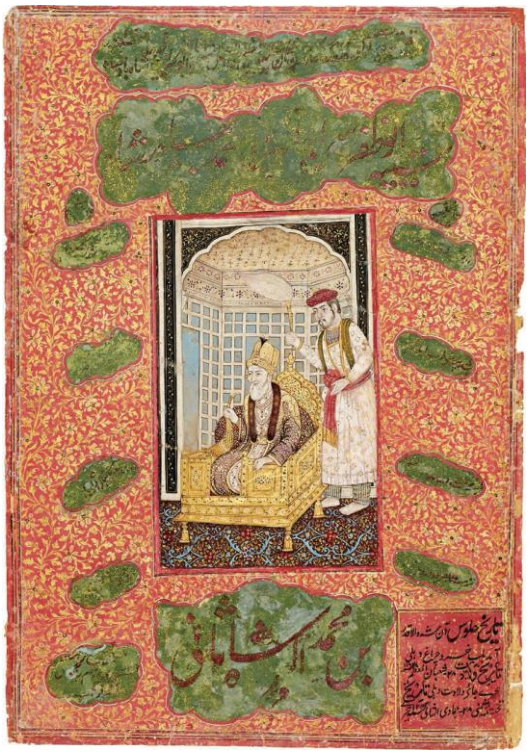

৪.১৭ বাহাদুর শাহ জাফর, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লেটার মোগল ১৮৫০ খ্রি.

(১) এ্যালবামটির নামকরণ করা হয়েছে- 'Gulshan-e-Tarikh'[২৫] অর্থাৎ ইতিহাসের বাগান।

(২)এ্যালবামটি পারশিয়ান কাব্যিক ছন্দে লিখিত যার অর্থ দাড়ায় এমন- পৃথিবীতে এই এ্যালবামটি জনপ্রিয় হওয়ায় কারণ হোল মানুষ এটাকে সার্বজনীন সমর্থন দিয়েছেন এবং ছবিগুলো আলোকোজ্জ্বল। প্রত্যেকেই বলেছেন যে, এ্যালবামটি অসাধারণ এবং বাদশাহ ও সভাসদদের প্রতিনিধিত্ব করার পূর্ণ গুনসম্পন্ন এবং সংগ্রহের যোগ্য মূল্যবান চিত্রকর্ম। এই পংক্তিমালাটি রচনা করেন (Khosu Bishan) খসু বিসান।

(৩).উল্লেখিত কবিতার রচয়িতা যেমন খসু বিসান (Khosu Bishan) তেমনি এই এ্যালবামের হস্তলিখনটিও কবির নিজের হাতের।

মূলত *'মুরাক্কা'* টিতে প্রধানত ষোলটি প্রতিকৃতি সম্বলিত সুবিন্যস্ত তালিকা। আমরা এটিকে বোঝার জন্য প্রতি পাঁচটি পাতাকে এক্ষত্রে গুচ্ছআকারে বিন্যস্থ করেছি। *'মুরাক্কা'* টির প্রথম ও শেষ পাতা কেবলমাত্র হস্তলিখন দ্বারা সুসজ্জিত এবং ডান দিকে যে সকল ছবি তা মূল মুরাক্কাতেই আছে। প্রত্যেক ছবি নিম্নবর্ণিতভাবে বিভক্ত :

- প্রথম পাতাতে ব্যবহৃত হস্তলিখন যা প্রতিকৃতিকে ঘিরে আছে তা ইংরেজীতে অনুদিত
- দ্বিতীয় পাতাটি আলোকপ্রবাহী কিন্তু অসচ্ছ কাগজ ছাড়া তৈরী যেখানে প্রতিকৃতিকে ঘিরে আছে পারশিয়ান ভাষা যা *মুরক্কা* তে যেভাবে আছে সেভাবেই করা হয়েছে। এখানে ফার্সি ভাষার অনুবাদ ইংরেজিতে সহজভাবে করা হয়েছে আলাদাভাবে প্রত্যেক ফলিও (Folio) তে
- তৃতীয় পাতাটি মূল প্রতিকৃতি এ হস্তলিখনের অংশ সংযোগে গঠিত যা *'মুরাক্কা'* টিতে দৃশ্যমান
- আর পঞ্চম পাতাতে বাদশাহ নিজেই বড় আকারে প্রতিকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছেন যার মধ্যমনি তিনি। কিন্তু হস্তলিখন ব্যতিত এই পাতাকে, অধিকতর বোঝার জন্য রাজকীয় ও আভিজাত্য প্রকাশ বুঝতে অনেকটাই সহজকরে দিয়েছে

প্রসংগত উল্লেখ্য 'গুলশান-ই-তারিখ' *'মুরাক্কা'*তে ব্যবহৃত অনেক প্রতিকৃতি পূর্ববর্তী অংশের সাথে সংযুক্ত যা এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। এ্যালবামটির সময়কাল অনেক সময় প্রকাশ করা হয়েছে আবার তাকে ম্রিয়মান করা হয়েছে এই কারণে যে, উল্লেখিত সময় এবং অভিলিখন আশানুরূপভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যে সকল যায়গাতে এটি সংগঠিত হয়েছে সেখানে ঐ অংশটি অনুজ্জ্বল বা অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছে।

'প্রতিকৃতিযুক্ত আরও একাধিক বংশলতিকা পাওয়া গেছে মোগল *'মুরাক্কা'*গুলোতে। প্রথমটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অটো কুটর্স। এর প্রথমটিতে দুটি তালিকা। একটি জাহাঙ্গীর ও তাঁর পুত্র পৌত্রদের। অন্যটি শাহজাহান ও তাঁট চার পুত্রের কিছু অসমাপ্ত ছবি'।[২৬]

(ঙ) শিকারনামা

৪.১৮ শিকারনামা, আগা রিজা, বস্টন মিউজিয়াম, ১৬০৭-২০ খ্রি:

'শিকারনামা' (ছবি নং-৪.১৮) নামে অপর একটি মোগল *'মুরাক্কা'* যার চিত্রের বিষয়বস্তু হোল মোগল । এই এ্যালবামে দেখা যায় যে, শাহযাদা সেলিম (ভবিষ্যতের বাদশাহ জাহাঙ্গীর) একটি গন্ডার ও একটি সিংহকে হত্যা করে পদতলে নিয়ে দাড়িয়ে আছেন। চিত্রটিতে এর কলাকৌশলে সাময়িক উন্মত্ততা রয়েছে। চিত্রের অগ্রভূমিতে যুবরাজ দু পা ফাকা করে দাড়ানো একটি হাতি এবং পশ্চাতদেশে একটি চিতাবাঘ হরিণ শিকারে উদ্যত আছে। ছবিটির মধ্যভাগে একজন প্রহরী বা সহকারী মৃত সিংহটির মাথা উঁচু করে ধরে তার মৃত্যু নিশ্চিত করছে। পশু পাখির চিত্রায়ন মোগল দরবারে জাহাঙ্গীরের সময়কালে নতুন মাত্রা নিয়ে এলেও শিকারের দৃশ্য রাজকীয় আভিযাত্য ও শাসকের শক্তিমত্তার প্রতীক। পারস্য চিত্রকলাতে যেরূপ 'কালিলা ওয়া দিমনা'র চিত্রায়নের মাধ্যমে জীব-জন্তুর চিত্রায়নের সূত্রপাত ঘটে কালক্রমে তা ভারতীয় চিত্রশিল্পে আলাদা একটি মাত্রা লাভ করে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর নিজে পশু পাখি প্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা ছিল ।

তথ্যসূত্র

১. T.W Arnold, *Bihzad and his Zafarnama*, London, Ms., 1930, p. 2

২. Percy Brown, *Indian Painting Under the Mughals (1550-1750 A.D)*, London, Oxford University Press, 1924, p. 114

৩. রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরুপ : মুঘল চিত্রকলা*, কলিকাতা, থীমা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৬

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৫. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৯, পৃ. ৩১৯

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩

৮. অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা* (প্রথম খন্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১২০

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

১২. রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১

১৩. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮

১৪. *চারুকলা*,রাজ্য চারুকলা পর্ষদ পত্রিকা, সম্পাদক অশোক ভট্টাচার্য, ৪র্থ সংখ্যা, সন ১৪১৬ (ইং-২০০৯),

কলিকাতা, পৃ. ৫৩

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

১৬. Najma Khan Majlis, *Women Painters During the Time of Emperor Jahangir (1605-1627 A.D.), Journan of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol.xxxi, No.2, December 1986, p. 1-3

১৭. চারুকলা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

১৮. চারুকলা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

১৯. চারুকলা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

২০. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

২১. Hamama Tul Bushra, *Gulshan Muraqqa : An Imperial Discretion*, Missouri, University of Missouri-Kansas City, 2016, p. 6

২২. এ.বি.এম হোসেন, ইসলামী চিত্রকলা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, পৃ. ১০৬

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪-১৯৫

২৪. Anil Relia, *The Indian Portrait-iv* (muraqqa- an Anthoiogical Journey of Mughal Empire, Ahmedabad, Amdavad ni Gufa, 2014, p. 14

২৫. *Ibid*., p. 20

২৬. রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

২৭. আব্বাসী মেহবুব হুসাইন আহমেদ হুসেইন গুজরাট কলেজ আহমেদাবাদ এর পারশিয়ান বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। তিনি ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় প্রেসিডেন্টের নিকট হতে পারশিয়ান ভাষাতে অসামান্ন অবদান রাখার স্বিকৃতি স্বরূপ সনদ প্রাপ্ত হন। তিনি সম্মানসূচক গবেষণা সহকারী হিসেবে হযরত পীর মোহাম্মাদ শাহ লাইব্রেরী, আহমেদাবাদ এ কাজ করেন। গ্রন্থাগারটি ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের একটি যেখানে আরবী, উর্দূ, ফার্সি, তুর্কি ও সিন্দি ভাষার মূল নথিপত্র সংরক্ষিত আছে। গুজরাট সাহিত্য একাডেমী হতে তাঁর লিখিত অনেক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত তিনিই (Gulshan-e-Tarikh) গুলশান-ই-তারিখ এর হস্তলিখনের অংশগুলো পারশিয়ান ভাষা হোতে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বাদশাহ শাহজাহানের সময়কালের মুরাক্কা

পনেরশ একানব্বই খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজপুত স্ত্রী জগৎ গোসাঞ্জির কোল জুড়ে যে শিশু লাহোরে জন্ম নেয় তিনিই মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত বাদশাহ শাহজাহান। খুররম নামের এই যুবরাজ পিতামহ আকবরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আকবরের নি:সন্তান স্ত্রী রোকাইয়া বেগম কর্তৃক লালিত-পালিত হন । তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে সে যুগের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মোল্লা কাশেম বেগ তাব্রেজি, হাকিম আলী জীলানী, শেখ সুফী, শেখ আবুল খায়েরের মত ফণজন্মা শিক্ষকগণের নিকট ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিদ্যা সহ ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন।[১] হিন্দি ভাষাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর কুশলী কূটনৈতিক আসফ খানের সহায়তায় 'শাহাব উদ্দিন আবুল মুজাফফর মোহাম্মাদ সাহিব-ই-কিরান সানী শাহজাহান পাদশাহ গাজী' উপাধি নিয়ে সিংহাসন আরোহন করেন এবং ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্বর্ণালী জীবণের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাদশাহ এর গর্ব ছিল তিনি মর্ত্যে স্বর্গ রচনা করেছেন। তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির ওপর নির্মিত জগদ্বিখ্যাত প্রেমের স্মারক 'তাজমহল' এর অমর শ্রষ্টা। ইউরোপিয় পর্যটক তাভানিয়ে বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে বিশ হাজার দক্ষ কারিগর দীর্ঘ বাইশ বছর নিরলস পরিশ্রম করে ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। মূল পরিকল্পনা করেছিলেন শিল্পী ইসফানদিয়ার রুমী। তাজমহলের নির্মাণের প্রধান স্থপতি ছিলেন ইরানের শিল্পী ওস্তাদ ঈসা সিরাজী। বলা হয় তরুণ বাঙালী শিল্পী বলদেও দাস[২] ছিলেন তাজমহলের অন্যতম রূপকার। মর্মর পাথরের গায়ে আরবি অক্ষরে কোরআনের আয়াত অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলেন বাগদাদের এক তরুণ শিল্পী। খোদিত আরবি লিপিমালা দূর থেকে দেখলে মনে হয় ফুটন্ত ফুল। এর নির্মাণ শৈলী ও পরিকল্পনায় ইন্দো-পারসীয় প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- বাদশাহ শাহজাহান স্থাপত্যের প্রতি মাত্রারিক্ত অনুরক্ত ছিলেন। যে কারণে অনেক সমালোচক বলেছেন, শাহজাহানের সময় হতে মোগল চিত্রকলার অধপতন শুরু হয়। তাঁর রাজত্বকাল মোগল ইতিহাসের সমৃদ্ধি ও ক্ষয়িষ্ণুতার বন্ধনে আবদ্ধ। স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে এই সময়কার উন্নতি পূর্ববর্তী শাসকদের পরম্পরাকে অনেকাংশে অতিক্রম করে। কিন্তু মোগল শাসনের সামরিক ও

প্রশাসনিক দূর্বলতাগুলো বাদশার অজান্তেই দানা বাধতে থাকে এবং প্রতিপত্তি ও ক্ষমতায় অদ্বিতীয় যে সাম্রাজ্য সেখানে উত্তরাধীকার এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তা পতনের পথে অগ্রসর হয়।

শাসন ক্ষমতায় বসে শাহজাহান তাঁর পিতামহ বাদশাহ আকবরের প্রতি সম্মানের অংশ হিসেবে রাজধানী আগ্রার নামকরণ করেন 'আকবরাবাদ'। বাদশার সিংহাসন আরোহনের ঘটনাকে স্মরণীয় করতে পরের বৎসরে তিনি প্রথম 'নওরোজ উৎসব' পালন করেন এবং উৎসবে অকাতরে রাজপরিবার ও অমাত্যবর্গের মধ্যে প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন বিতরণ করেন। মাত্র ৪ বৎসর শাসনামলের সময় তাঁর জীবনে এক আকষ্যিক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। চতুর্দশ সন্তানের প্রসবকালে সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের মৃত্যু হয়। উদ্ভাবনী ও ধীশক্তি সম্পন্ন বাদশাহ মনোবেদনাতে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

বাদশাহ শাহজাহানের সময় মোগল চিত্রকলা একটা পরিণত অবস্থায় পৌছায় । এই সময় চিত্রকলা দুইভাগে চিত্রিত হয় প্রথমত পান্ডুলিপি ও দ্বিতীয়ত *'মুরাক্কা'* । পান্ডুলিপির মধ্যে বাদশাহের জীবনচরিত 'বাদশাহনামা', বাদশাহের বিখ্যাত সভাসদ জাফর খানের 'মসনভি', শাহজাদা দানিয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত 'সুয ওয়া গুদায'(১৬০০-১৬১০ খ্রি:), সাদীর 'বুস্তান' ও 'গুলিস্তান'(১৬২৮-১৬৩০ খ্রি:)। তবে প্রতিকৃতি চিত্র, দরবার দৃশ্য বা রাজকীয় ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্রকরে নির্মিত *'মুরাক্কা'* বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে চিত্রিত হয়। এই সময় দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল, আর মোগল দরবার ছিল জাকজমকতায় ভরপুর । তাঁর শাসনামলের বহু চিত্র নিদর্শন থেকে প্রমানিত হয় যে তিনিও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী ছিলেন । এই সময় শিল্পীরা সাম্রাজ্যর গৌরবগাঁথা এবং বাদশাহের প্রশংসা করে চিত্র তৈরী করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিত্র শিল্পচীরা হোলেন- চিতরমন, অনুপছতর, মনোহর, মুহম্মদ নাদির সমরকন্দি, মীর হাশিম ও মহম্মদ ফকিরূল্লাহ ।[৩]

১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ছয়টি ছবির বিশেষ উল্লেখ করে স্যার জশুয়া রেনল্ডস্ এর ভূয়সি প্রশংসা করেন।[৪] আর জনসন কালেকশান নামে যে সংগ্রহটি তার একটি বিখ্যাত ছবি হলো শিল্পী মনোহরের আঁকা দারাশিকোহর শখের শিকারী ঘোড়া 'দিলপছন্দ' এর প্রতিকৃতি । ব্রিটিশ মিউজিয়াম রাজ লাইব্রেরিতে স্হান পাওয়া আরো একটি ছবি বিখ্যাত । সেটি হলো- সম্রাট ফররুখশিয়ারের পায়ের তলায় বিড়াল সহ চিত্র । আর একটি বিখ্যাত সাদা-কালোর স্কেচে আঁকা শাহজাহানের বন্ধু ও সভাসদ 'মৃত্যু পথযাত্রি এনায়েত খাঁ' শিরোনামের প্রতিকৃতিটি বাস্তবিক অর্থেই মৃত্যু অপেক্ষমান একজন মানুষের করুণ মুখের প্রতিচ্ছবি ।[৫]

(ক) শাহজাহানের *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবাম :

চিত্রকলার প্রতি বাদশাহের অবদানের অনন্য নজির হলো 'শাহজাহান এ্যালবাম' যা 'রাজকীয় এ্যালবাম' অথবা 'কেভরকিয়ান এ্যালবাম' নামে পরিচিত। এখানে ৫০টি মুখাবয়ব ও হস্তলিখন এর সংগ্রহ রয়েছে। এর মধ্যে ৪১ টি মেট্রোপলিটন জাদুঘর এবং ৯টি ফ্রেইরির গ্যালারী অব আর্টের সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। এই অনন্য সাধারণ সংগ্রহটি প্রকৃতির নিবিড় দৃশ্য, রাজকীয় পরিবার ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের ছবি এবং দক্ষ ও নিপুণ হাতে তৈরী দৃষ্টিনন্দন মনোমুগ্ধকর হস্তলিখন পাতা যা রাজকীয় আভিজাত্য ও জীবন যাত্রার দৃশ্যপটকে চিত্রকর ও সংগ্রাহকদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছিয়েছে।

এই বিখ্যাত এ্যালবামটি বাদশাহ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৭ খ্রিষ্টাব্দ) এর উদ্যোগে শুরু হয় এবং শাহজাহান এর নিকট হস্তান্তর করার পর হতে (১৬২৮-৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) এর মধ্যে বহুবিধ চিত্র, হস্তলিখন ও নিদর্শন বিদ্যমান। কালের পরিক্রমাতে এ্যালবামটি শাহজাহানের পুত্র যুবরাজ আওরাঙজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ) এর নিকট যায়। ঘটনার সত্যতায় মেলে যে, চিত্রের সংগ্রহের মধ্যকার একটি অংশে আঠারটি ফলিও সংযুক্ত করে এ্যালবামটি পুনরায় গ্রথিত করা হয়। সংযুক্ত চিত্রাবলীর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সতের শতকের মোগল চিত্রকলার সরলতা ও ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে 'শাহজাহান এ্যালবাম'টি সতের শতক হতে উনিশ শতকের বৈচিত্রপূর্ণ রুপ, রস ও গন্ধে পূর্ণ এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে।

এই এ্যালবামে দেখা যায়- একক পাতাতে চিত্রাংকনরীতি পদ্ধতি ছিল ষোল শতকের মাঝ পর্যন্ত এবং কিছুটা পরও। একক পাতাগুলো প্রাচীন গ্রন্থারাজীর বিষয়বস্তু সম্বলিত হস্তলিখন, চিত্রাবলী একসাথে বাধাই করা হত যা কিনা পনের শতকের গোড়ার দিকে ঈরাণী রীতির উত্তরসূরী যাকে বলা হয় *'মুরাক্কা'*। তৈমুরের সময়কালে (১৩৮৯-১৫০৮ খ্রি:) এই এ্যালবাম গুলো করা হতো- সমসাময়িক কালের পৃষ্ঠপোষকদের সংগ্রহের জন্য এবং যথাবিহিত চিত্রাংকন ও নির্বাচিত সাহিত্য ও স্বনামধন্য ধর্মীয় ও লৌকিক কাহিনী নির্ভর বিষয়বস্তু এবং হস্তলিখনের নমুনা। প্রাথমিক *'মুরাক্কা'*র লিখিত প্রমাণাদির তথ্য মেলে মোগল আমলে, বাদশাহ আকবরের সময়ে যার সূত্রপাত হয় এবং এর ব্যাপ্তী ছিল জাহাঙ্গীরের সময়কাল পর্যন্ত । প্রাচীন গ্রন্থরাজীর চিত্রিত অনুলিপি সম্বলিত এই এ্যালবামটি বাছাইকৃত প্রাকৃতিক পাঠ্য বিষয়বস্তুর চিত্র এবং একক ব্যক্তির ছবি। ছবিগুলো ততোধিক বড় নয় যতটা বড় এর টেক্সট, ছবির চরিত্রগুলো/ ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত কোমল দৃষ্টিগ্রাহ্য ও মোলায়েম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা ইতিপূর্বে মোগল চিত্রে অনুপস্থিত ছিল। ইতিপূর্বে যা ছিল আকবরের মুষ্টিবদ্ধ তরবারী হাতে যা চার্চের প্রার্থনাকারী হেলেপড়া চরিত্রের মত। আকবরের (সংগ্রহ নং-৫৫.১২১.১০.২২) প্রতিকৃতিতে তাঁর

উজ্জ্বল গোলাকার জমিনে মুখমন্ডল এবং তাঁর দাড়ানোর ভংগীমা তাঁর বয়স ও ব্যক্তিত্বের বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

'মুরাক্কা-ই-শাহজাহান' এর কিছু চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হলো :

আকবর সিংহ ও গরুর বাছুরের সাথে দাড়ানো (ছবি নং ৫.১) : বর্ণনা- চিত্রকর গোবর্ধনা (১৫৯৬-১৬৪৫ খ্রি:), হস্তলিখনী- মীর আলী হারাভী (১৫৫০ খ্রি:), বিষয়বস্তু এ্যালবাম এর একক পাতা, তারিখ বামপাতা ১৬৩০, ডানপাতা-১৫৩০-৫০, দৃশ্যপট ভারতীয়, মাধ্যম- কালি, আলোনিরোধক (opaque) জলরঙ, সোনায় মোড়ানো পাতা,মাপ- H.15.5/ 16in (38.4cm), w. 101/ 8in (25.7cm), ধরণ, প্রাচীন পান্ডুলিপি, প্রাপ্তী তথ্য- ছবিটি রেজার্স ফান্ড (Ragers Fund) এবং কেভরকিয়ন ফাউন্ডেশনের উপহার (Kevorkian Foundation Gift-1955)।

৫.১ আকবর সিংহ ও গরুর বাছুর, গোবর্ধন, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬৪০ খ্রি:

বিখ্যাত চার ব্যক্তির প্রতিকৃতি : অন্য একটি চিত্রে (৫৫, ১২১. ১০. ২৯) চার জন মোগল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ছবি (ছবি নং ৫.২)। একই পাতাতে চার ভাগে বিভক্ত করে আলাদাভাবে চারটি ছবি চিত্রিত হয়েছে। উপরে বামের ছবি একজন রাজার ছবি এবং সম্ভবত রাজা সারাঙ রয় এর চিত্র। চিত্রকর বালচান্দ। উপরের ডানদিকে ইনায়েত খান এবং চিত্রকর দৌলত। নীচে বামে আবু আল খালিক এবং চিত্রকর সম্ভবত বালচান্দ, নীচের ডান দিকে জামাল খান কারাভুল এবং চিত্রকর মুরাদ।

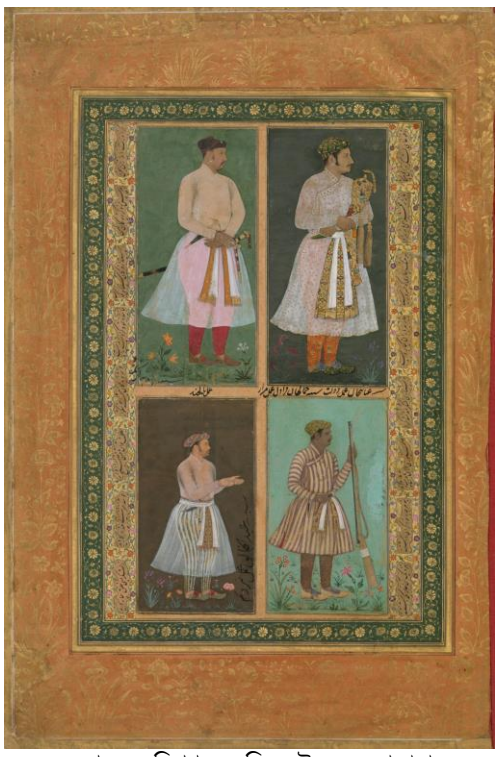

৫.২ চারজন বিখ্যাত ব্যক্তি, দৌলত ও বালাচান্দ, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬৩৫ খ্রি:

বর্ণনা- চিত্রকর দৌলত (১৫৯৫-১৬৩৫ খ্রি:), বালাচান্দ (১৫৯৫-১৬৫০খ্রি:), মুরাদ। পান্ডুলিপির পাতা। তারিখ বামপাতা- ১৬১০-১৫, ডানপাতা- ১৫৪১, ভারতীয় প্রেক্ষাপটের উপর চিত্রিত ভূদৃশ্য (landscape), মাধ্যম কালি, অনুজ্জ্বল জল রঙ এবং কাগজের উপর সোনার প্রলেপ। পরিমাপ- ৩৮.৬ সে. মি. × ২৫ × ৯ সে. মি। বর্ডারের মধ্যের অংকন ২৯.২ × ২২.৫ সে. মি.। ৪টি ছবি আলাদাভাবে যে পরিমাপ তা হল কম বেশী মাপে তৈরী। মূলত: এটি পান্ডুলিপির পাতা। ছবিটি রেজার্স ফান্ড (Ragers Fund) এবং কেভরকিয়ন ফাউন্ডেশনের উপহার (Kevorkian Foundation Gift-1955)। পাতাতে চিত্রিত প্রতিকৃতি (Portrait) গুলো বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জন্য তৈরী করা হয় (১৬০৫-২৭ খ্রি:)। ইনায়েত খানের যে চিত্রটি সেটিতে তাঁকে বেশ সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হোলেও মূলত তিনি আফিম খোর ও মদ্যপ ছিলেন। ছবিটি সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর দুয়ারে পৌছার পূর্বেকার। আবু আল খালিকের চিত্রটিও তাঁর মৃত্যু পূর্ববর্তী চিত্র। তিনি শাহজাহানের সাথে তাঁর পিতার বিরুদ্ধাচারণে শাহজাহানের পক্ষ নিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। জামাল খান কারাভুল একজন মহৎ ব্যক্তি। আর রাজা সারাঙ এর সম্পর্কে বাদশাহের হস্তলিখন হতে অস্পষ্টতার কারণে কিছু উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি।

অশ্বারোহী শাহজাহান (ছবি নং ৫.৩) : চিত্রকর পায়াগ (Payag) যিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পী (১৫৯১-১৬৫৮খ্রি:)। হস্তলিখন শিল্পী মীর আলী হারাভী (১৫৫০ খ্রি:)। এটি একটি পান্ডুলিপির পাতা। তারিখ বামপাতা-১৬৩০ এবং ডান পাতা- ১৫৩০-৫০ খ্রি: এবং অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আঁকা। কালি, অনুজ্জ্বল জল রঙ এবং কাগজের উপর সোনার প্রলেপ সহযোগে তৈরী। পরিমাপ- ৩৮.৯ × ২৫.৭ সে. মি. এবং পান্ডুলিপির এই পাতাটি ছবিটি রেজার্স ফান্ড (Ragers Fund) এবং কেভরকিয়ন ফাউন্ডেশন এর উপহার (Kevorkian Foundation Gift-1955)। বস্তুত পায়াগ (Payag) বাদশাহ আকবরের সময়কাল হতে

৫.৩ অশ্বারোহী শাহজাহান, পায়াগ, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬৫০ খ্রি:

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়কাল পর্যন্ত শিল্পচর্চা করেন। তিনি ও তাঁর ভাই বালচান্দ প্রায় সাত দশকের অধিককাল এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই অসাধারণ ঘোড় সওয়ারী চিত্রটির 'হাশিয়া'য় শাহজাহান নিজের হাতে কিছু মন্তব্য লেখেন। অতি সম্প্রতি মাইক্রোসকোপিক স্বাক্ষর যা সোনালী হালকা আভাতে অংকীত রয়েছে যা প্রমাণিত।

লাল মাথা ওয়ালা শকুন ও ধারালো ঠোটওয়ালা শকুন (ছবি নং ৫.৪) : অনন্য এই শিল্পকর্মটির চিত্রকর ওস্তাদ মনসুর (১৫৮৯-১৬২৬ খ্রি:) এবং হস্তলিখন শিল্পী মীর আলী হারাভী (১৫৫০ খ্রি:)। এর সময়কাল- বামপাতা- ১৬১৫-২০ খ্রি: এবং ডানপাতা ১৫৩৫-৪৫ খ্রি: যা ভারতীয় প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপটে চিত্রায়িত। কালি, অনুজ্জ্বল জল রঙ এবং পাতার উপর সোনালী প্রলেপে অংকীত। এর পরিমাপ ৩৯.১ × ২৫. ৬ সে. মি। ছবিটি রেজার্স ফান্ড (Ragers Fund) এবং কেভরকিয়ন ফাউন্ডেশন এর উপহার (Kevorkian Foundation Gift-1955) । ওস্তাদ মনসুর একজন দক্ষ চিত্রকর বিশেষত

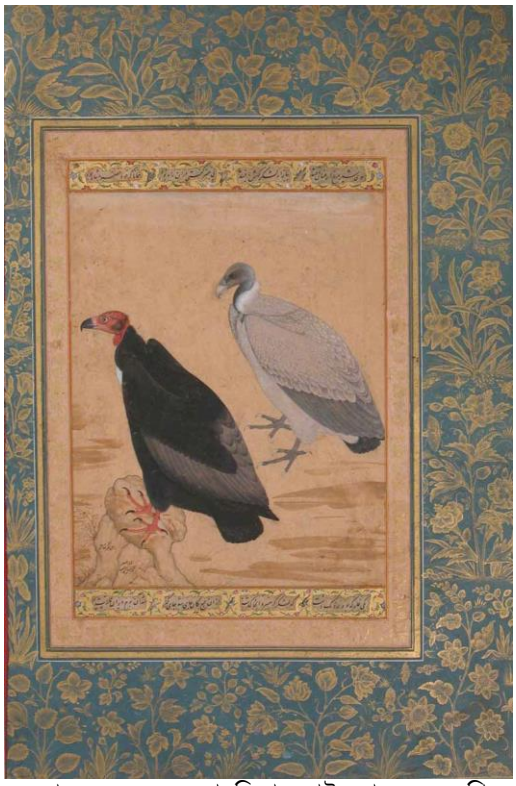

৫.৪ শকুন, মনসুর, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬২৬ খ্রি:

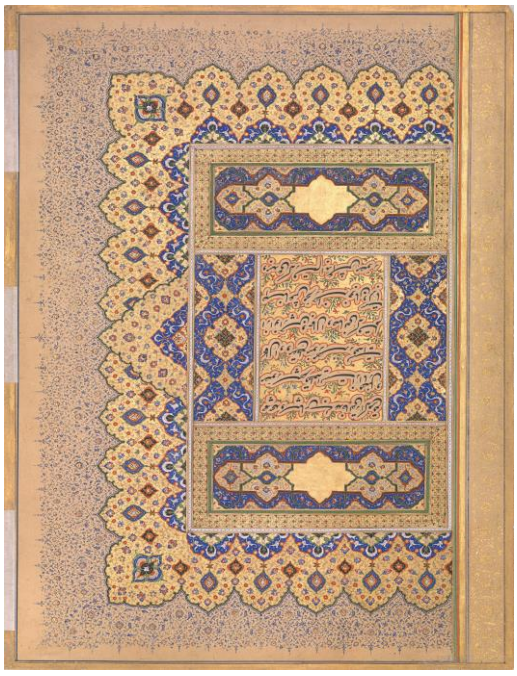

৫.৫ ক্যালিগ্রাফির পাতা, মীর আলী হারভী, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন. ১৬৩০ খ্রি:

উদ্ভিদকূল এবং প্রাণীকুলের উপর। সে কারণে তাঁকে 'নাদির আল আছার' (rare one of the age) উপাধি দেয়া হয়। দৃশ্যত শকুন দুটি পরস্পর বিবাদমান তবে তা ধীরস্থির এবং প্রশান্ত পরিবেশের প্রতিচ্ছবি। মনসুরের ব্রাশের ছোয়াতে তাদের ধুসর কালো রং এবং মাথার লাল রঙ বাস্তবতার চাইতে অতি বাস্তবতা। মাটির রঙ এবং তার বিন্যাসে অর্ধ ভাঙ্গা পাথরের ব্যবহার প্রেক্ষাপটকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। সকল ক্ষেত্রেই যে প্রকৃতির আসল চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে

তা নয় তবে চিত্রকর নিজস্ব কল্পনাশক্তি হতে তাকে স্বপ্নময় করে তুলেছেন।

ক্যালিগ্রাফীর একটি পাতা (ছবি নং ৫.৫) : হস্তলেখক মীর আলী হারভী (১৫৫০ খ্রি:) কর্তৃক একটি পান্ডুলিপির পাতার চিত্রায়ন। সময়কাল বামপাতা ১৬৩০-৪০ খ্রি: এবং ডানপাতা ১৫৪০ খ্রি:। চিত্রটি ভারতীয় উপাদানে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। কালি, অনুজ্জ্বল জলরঙ এবং কাগজের উপর সোনালী প্রোলেপে চিত্রিত। পরিমাপ- ৩৮.৭×২৬.৪ সে. মি. এবং যথারীতি প্রাচীন পান্ডুলিপির পাতা। ক্রয়কৃত এই শিল্পকর্মটি রেজার্স ফান্ড (Ragers Fund) এবং কেভরকিয়ন ফাউন্ডেশন এর উপহার (Kevorkian Foundation Gift-1955) । এই পান্ডুলিপিটি দুইপাতা বিশিষ্ট যা ফ্রেমিং কলাম দ্বারা সুশোভিত। চিত্রকর মীর আলী হারভী ১৬ শতকের গোড়ার দিকে তৈমুরীয় শিল্পচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিরাতে তাঁর কর্মকান্ড শুরু করেন। লেখাগুলো নিজেই মেঘমালার বুদ-বুদ দ্বারা ঘেরা এবং তলোয়ারের আকৃতির পাতাবিশিষ্ট ফুলগাছ, লিলি বা পদ্মফুল সম এবং অন্যান্য ফুলের নকসা দ্বারা আবৃত।

শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ফিতা দ্বারা তৈরী গোলাপাকৃতির ব্যাজ বা প্রস্তরকার্যে খোদাইকরা গোলাপ যা বাদশাহ শাহজাহানের নাম ও উপাধি বহন করছে (ছবি নং ৫.৬) : পান্ডুলিপির পাতা, সময়কাল বামপাতা- ১৬৪৫ খ্রি:, বামপাতা ১৬৩০-৪০ খ্রি: এবং পরিপূর্ণ ভারতীয় উপকরণ ও শিল্পী দ্বারা চিত্রিত। কালি, অনুজ্জ্বল জল রঙ এবং সোনালী প্রলেপ দ্বারা পাতা রঞ্জিত। পরিমাপ ৩৮.৬ × ২৬.৫ সে. মি যা প্রাচীন পান্ডুলিপির অনুকরণে তৈরী। ছবিটি রেজার্স ফান্ড (Ragers Fund) এবং কেভরকিয়ন ফাউন্ডেশন এর উপহার (Kevorkian Foundation Gift-1955) ।

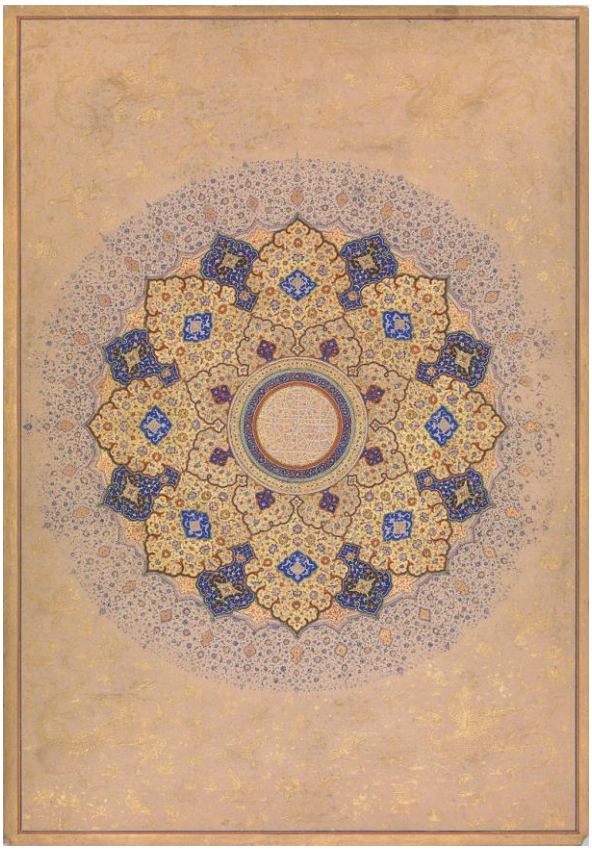

৫.৬ শোভাবর্ধন ফিতা, কেভারকিয়ান ফাউন্ডেশন, ১৬৪৫ খ্রি:

এই উদযাপনের রাজকীয় মোগল *'মুরাক্কা'* টি শাহাজাহানের রাজকীয় এ্যালবামে স্থান পেয়েছে। এটা মূলত ৫০টি পাতার একটি চিত্রকর্মের সমষ্টি যাতে সন্নিবেশিত আছে উদযাপন এবং হস্তলিখনের নমুনা। এর ৩৯টির সময়কাল সপ্তদশ শতক এবং বাকীগুলোর সময়কাল ১৯ শতকের গোড়ার দিকের। প্রাথমিক কর্মযজ্ঞগুলোর পৃষ্টোপেষক বাদশাহ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭ খ্রি:) তবে তা তাঁর পুত্র শাহজাহানের (১৬২৭-৫৮ খ্রি:) উৎসাহে এবং তারই সংযুক্তি। বস্তুত শাহজাহান এ্যালবামটি তাঁদের পারিবারিক ও রাজকীয় রাজন্যবর্গ দ্বারা প্রস্তুত তবে তা সকলই একই বিষয় ও পরিধিতে আবদ্ধ। এগুলোকে তথাকথিত ওয়ানটেজ (Wantage) এবং মিন্টো এ্যালবাম (Minto Album) যা বৃটিশ সংগ্রহে বিশেষত Victoria & Albert Museum, London এবং Chster Beatty library, Dublin এর সাথে তুলনীয়।

হস্তলিখনের অধিকাংশ চিত্রকর্ম শাহজাহান এ্যালবামে বিদ্যমান। এগুলো ১৬ শতকে পারস্য শিল্পী মীর আলী হারাভীর কর্ম যিনি প্রাথমিক জীবনে হিরাত এবং পরবর্তীতে বুখারাতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর যাদুকরী হস্তলিখন ভারতীয় মুসলিম চিত্রশিল্পের এক অনবদ্য সংগ্রহ। তিনি এ্যারাবেস্ক (Arabesque) নকসাকে ভিত্তিমূল ধরে ইন্দো-পারশিয়ান মোটিভগুলোকে সহজাত প্রাকৃতিক অবয়বে চিত্রায়ন করেছেন। ইতিপূর্বে সা'দির গুলিস্তানে সহজ জীবন প্রণালী নির্ভর করে এমন চরিত্র ফুটে উঠেছে। হস্তলিখনের পাতাতে তুগরা (Tughra) হস্তলিপির অনুকরণে লেখা রয়েছে 'His Majesty Shihabuddin Muhammad Shahjahan, the king, warrior of the faith, may Allah perpetuate his kingdom and sovereignty' । এই রাজকীয় মোগল এ্যালবামে উজ্জ্বল রঙ ও নানাবিধ সোনালী টোন্স ব্যবহৃত হয়েছে। এতে সূক্ষ নকসা ও এ্যারাবেস্ক নকসা সম্ভলিত অসাধারণ ফুলেল নকসা, পাখি ও প্রাণীদের চিত্র স্থান পেয়েছে।

প্রসঙ্গত ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ রেমব্রান্ট যখন আমষ্টারডামে বাস করতেন তখনই হয়তো শাহজাহানের শাসনকালের প্রথম দিকে সংকলিত একটি *'মুরাক্কা'*র বেশ কিছু চিত্র তাঁর হাতে আসে । মোগল চিত্রে রেখার নিপুন ব্যবহার, মুখের ভাব, পোষাকের বৈচিত্র তাঁকে উৎসাহিত করে- তিনি এগুলির অনুকরন করেন একাধিক রেখা চিত্রের মাধ্যমে । তার মধ্যে পচিশটি রেখাচিত্র আজও লাইডেন লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রয়েছে ।

(খ) দারাশিকোহ এ্যালবাম :

১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ শাহজাহানের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী মমতাজ মহলের কোল জুড়ে জন্ম নেন শাহজাদা দারাশিকোহ। বাদশাহের চার পুত্রের অন্যরা হলেন সুজা, আওরাঙ্গজেব এবং মুরাদ। দুই কন্যা জাহান আরা ও রওশন আরা। ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ শাহজাহানের অসুস্থতার গুজব রটে যায় যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ফলে সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সময় যুবরাজ দারাশিকোহ বড় পুত্র হিসেবে পাঞ্জাব ও দিল্লীর শাসক ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা, তৃতীয় পুত্র আওরাঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য ও কনিষ্ঠপুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসক।

জ্যেষ্ঠ সন্তান দারাশিকোর প্রতি বাদশাহের যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। ফলে অন্য সন্তানদের নিকট শাহজাহান বিরাগভাজন হন। সে কারণে বলা হয়ে থাকে শাহজাদা ও বাদশাহ রূপে গৌরবময় সময় কাটালেও মোগল বাদশাহদের মধ্যে শাহজাহানই সবচেয়ে করুণ দশায় অন্তিম সময় অতিবাহিত করেছেন। যা হোক, দারাশিকোহ ছিলেন উদার মতাবলম্বী। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার মনোভাবের কারণে গোড়া মুসলমান সমাজের নিকট তাঁর তেমন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।

উত্তরাধীকার প্রশ্নে আপন ভ্রাতাদের সাথে দারাশিকোর যে মতবিরোধ তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনিত হলে আফগানিস্তানের পথে দাদার নামক স্থানে মালিক জিওয়ান নামের এক বেলুচ সর্দারের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। প্রথিমধ্যে দারার স্ত্রী নাদিরা বেগম স্বামীর দূর্ভাগ্যের সাথী হয়ে একই সাথে পরিভ্রমণ করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রিয়তম স্বামীর এই ভাগ্য বিড়ম্বনা ও ভবঘুরে জীবন যাপন তাঁকে এতটাই ব্যাথিত করে যে দাদারেই তাঁর মৃত্যু হয়। নাদিরা বেগমের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে লাহোরে সমাহিত করা হয়। আর যে মালিক জিওয়ান দারাকে আশ্রয় দিয়েছিল সে বিশ্বাসঘাতকতা করে আওরাঙজেরের হাতে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দারা ও তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সিপহির শিকোহকে বন্দি অবস্থায় তুলে দেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দারা ও তাঁর পুত্রকে একটি রুগ্ন হাতির পিঠে চড়িয়ে দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হয়। সমকালীন ফরাসি পর্যটক ফ্রান্সিস বার্নিয়ে এই অমানবিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বন্দের করুণ উপহাস দিল্লীবাসীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আওরাঙ্গোর সভাসদ দানিশমন্দ খান শাহজাদার প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করে ব্যর্থ হন।

উপরন্ত শায়েস্তা খান ও বোন রওশন আরা দারাকে নাস্তিক বলে সাব্যস্ত করার প্রেক্ষিতে আলেম-উলামাদের ফতোয়া অনুসারে পিতা-পুত্রকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

সংস্কৃতিমনা শাহজাদা দারাশিকোহ চিত্র শিল্পের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর শিল্পী মানুষিকতার পরিচয় মেলে একটি *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবাম থেকে। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে (বর্তমানে বৃটিশ লাইব্রেরির ইন্ডিয়ান সেকশানে) সংরক্ষিত 'দারাশিকোহ এ্যালবাম' সপ্তদশ শতকের মোগল চিত্রকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন। দারা তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী নাদিরা বেগমকে ১৬৪১-৪২ খ্রিষ্টাব্দে অপূর্ব চিত্রাবলীতে পরিপূর্ণ এ্যালবামটি উপহার দেন।[৬] এই এ্যালবামে দারার ঘোড়া **'দিলপছন্দ'** (ছবি নং ৫.৭) এর অংকনে শিল্পী মনোহর যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তা অনন্য সাধারণ। এতে বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালের শিল্পকলার অনেক নিদর্শন রয়েছে। এর প্রায় চল্লিশটি চিত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৈল্পীক গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। এ্যালবামটি প্রতিকৃতি ছাড়াও বিভিন্ন পশুপক্ষী এবং লতাপাতার চিত্রাবলী দেখা যায়। শাহজাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর মুহাম্মাদ খানের অঙ্কিত একটি চিত্র রয়েছে।[৭] সাফাভী চিত্রের অনুকরণে পারস্যের পোষাক পরিহত একজন যুবাপুরুষের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে। এই সংগ্রহটির অন্য একটি বিখ্যাত ছবি হচ্ছে **'বুনো হাঁস'** (ছবি নং ৫.৮)।[৮] শিল্পী পরিচিত হোলেও ভিনসেন্ট স্মিথ

৫.৭ দিলপছন্দ, মনোহর, মর্ডার্ন মিউজিয়াম, দিল্লী, ১৬৪২ খ্রি:

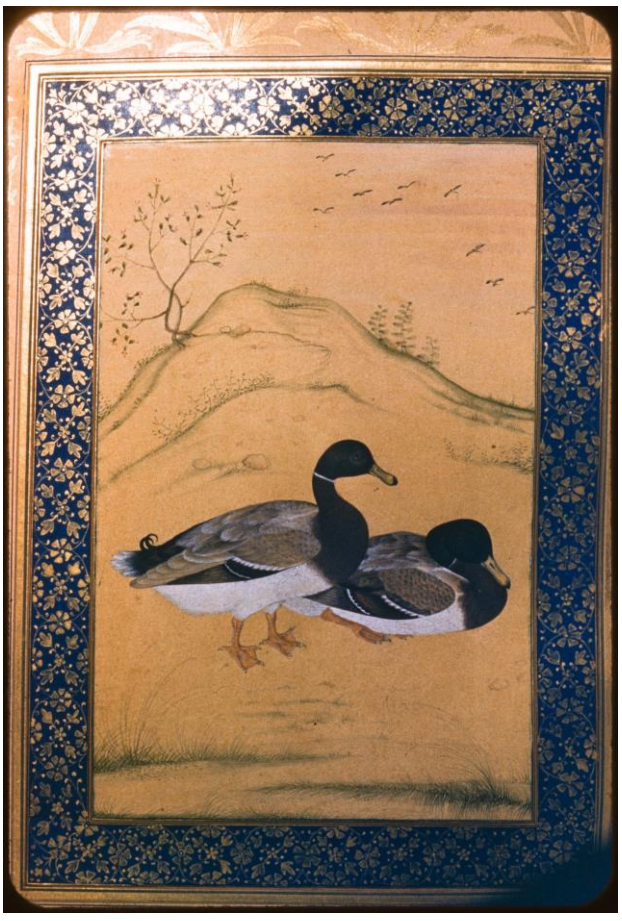

৫.৮ বন্য হাস, মুহাম্মদ খান, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৬৩৫ খ্রি:

বাস্তব পদ্ধতি ও পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

জগদ্বিখ্যাত দারাশিকোর *'মুরাক্কা'* যা বহির্বিশ্বে Dara Shikoh Album নামে একটি প্রদর্শনি যা ট্রেজারস গ্যালারী (Treasures Gallery) বৃটিশ লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনিতে দারাশিকোহ এ্যালবামের ৮টি ফলিও (Folio, Add. Or. 3129) প্রদর্শিত হয় এশিয়ান ও আফ্রিকান বিভাগের পক্ষ হতে। এ্যালবামটি দারাশিকোহ নিজেই (১৬১৫-৫৯ খ্রি:) সংরক্ষণ করে বাধাই করেছিলেন। লিখিত তথ্য অনুসারে জানা যায়- শাহজাদার নিজ হাতে লেখা এ্যালবামের তারিখ দুটি হোল- ১০৫৬ হি:/১৬৪৬-৪৭ খ্রি:। ফারসী ভাষাতে লিখিত অভিলিখনটির অর্থ হোল- অত্যন্ত মূল্যবান এই সংগ্রহটি তার প্রিয় কাছের বন্ধু নাদিরা বানু বেগমকে উৎসর্গ করা হোল দারাশিকোহ এর পক্ষ হতে যিনি শাহজাহানের পুত্র, তারিখ- ১০৫৬ হি:/১৬৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রদর্শিত চিত্রগুলো মুখোমুখি করে জোড়ায়-জোড়ায় বিন্যস্ত করা যেটা মোগল *'মুরাক্কা'*র চিরায়ত পদ্ধতি। ছবির বর্ণনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিকৃতিকে ঘিরে। তরুণ যুবরাজ ও শাহজাদী, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ফুল ও পাখির চিত্রায়নে *'মুরাক্কা'*টি শোভিত। ছবির অভ্যন্তরিন বর্ডারগুলো বা প্রান্তিক নক্সাগুলো অত্যন্ত পরিমার্জিত ও অর্থবহ যদিও অনেক ছবির পাতা নষ্ট হওয়াতে যেগুলো চোখে পড়ে না। বাহিরের বর্ডারগুলো ফুলেল নকসাতে তৈরী। এ্যালবামের ছবিগুলো খুবই সাধারণ ও মনোমুগ্ধকর। যে কারণে অনেক সময় সমালোচকগণ এই এ্যালবামটি বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের এ্যালবামের সমপর্যায়ে ভাবতে দ্বিধা করেছেন। তথাপি দারাশিকোহ এ্যালবামটি সেলিম ও খুররম এ্যালবামের মনোমুগ্ধতাকে ছাপিয়ে যায়।

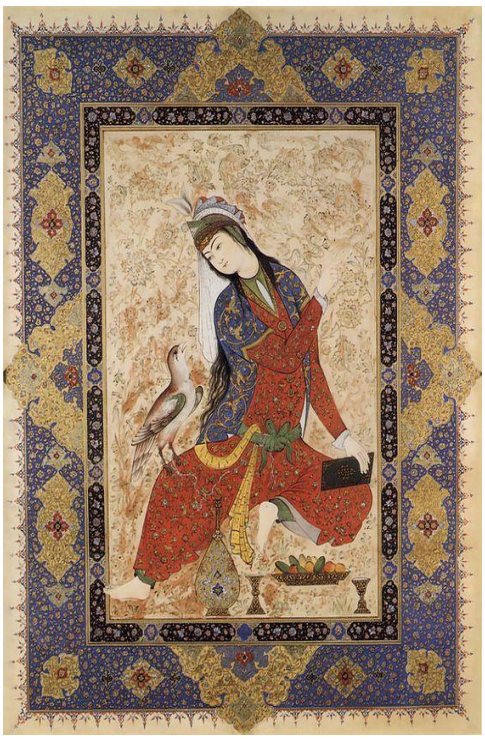

৫.৯ পারশিক যুবক, মুহাম্মদ খান, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৬৪০ খ্রি:

এই এ্যলবামের কয়েকটি চিত্রের বর্ণনা :

দারাশিকোহ ও জনৈক যুবক পরিচারক (Add Or 3129-f22r-1500; Add Or 3129-f21v- 1500) : ডানদিকে একজন যুবরাজ পাত্র হতে মদ ঢালছেন। বামদিকে-একজন যুবরাজ পাগড়ি সাদৃশ্য সেটে থাকা হ্যাট মুহাম্মদ খানকে অলংকরণের জন্য দিচ্ছেন। ছবিটিতে স্বাক্ষর মুহাম্মদ খান এর।

ছবিতে যুবরাজ পারসিয়ান ঐতিহ্যের পোষাক পরিধান করে আছেন এবং তার সাথে যিনি সহযোগী তিনিও অনুরুপ পোষাকে সজ্জিত। পুরো ছবির প্রেক্ষিতটি একই ধরণের ফুলের দ্বারা নাকসাকৃত। যদিও ছবিটি পারশিয়ান ভাবধারাতে তৈরী তথাপি এটা পারশিয়ান নয় বরং এটা মুহাম্মাদ খানের আঁকা ছবি। বলা হয়ে থাকে মুহাম্মাদ খান ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শিল্পী। দারাশিকোহ যখন ১৬৩০-৩২ খ্রিষ্টাব্দ বুরহানপুরে তাঁর রাজকার্যে ছিলেন সেই সময় তিনি শিল্পীকে খুঁজে নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে আগ্রাতে তাঁর সাথে নিয়ে আসেন। এই এ্যালবামের ফুলেল নকসার কাজগুলো কথিত মুহাম্মাদ খানেরই সৃষ্টি (ছবি নং ৫.৯)।

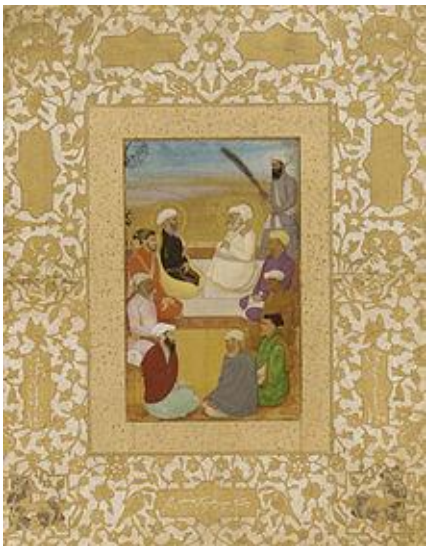

৫.১০ শিক্ষকের **সান্নিধ্যে** দারাশিকোহ, চিতরমন, বৃটিশ লাইব্রেরি, ১৬৩০ খ্রি:

যুবরাজ দারাশিকোহ (ছবি নং ৫.১০) (AddOr 3129- f34r – 1500- Add Or 3129- f33v- 1500) : ডানদিকে- দারাশিকোহ একজন শিক্ষকের সাথে, ছবিটির চিত্রকর চিতরমন। বৃটিশ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছবিটির সময়কাল ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ। বামের ছবি-একজন মহিলা নিজের মধ্যে আত্বনিমগ্ন যিনি সম্ভবত মমতাজ মহল, চিত্রকর বিশনদাস। বৃটিশ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছবিটির সময়কাল ১৬৩১-৩০ খ্রিষ্টাব্দ। ছবি দুটির চিত্রায়ণে পরস্পরের প্রতি মুখোমুখি হয়ে আছেন। অভ্যন্তরিণ বর্ডারগুলো ঠিকমত সংযুক্ত হয়নি এমনকি পূর্ববর্তী পাতার নকসা কাটার সাথে। যুবরাজকে তার বয়সের তুলনায় বারো বছরের বলে মনে হোচ্ছে। তিনি তাঁর শিক্ষকের হাত ধরে আছেন এবং শিক্ষক অন্যহাতে বই ধরে আছেন। হালকা রঙে আঁকা চিতরমনের এই ছবিতে যুবরাজকে মূখ্য চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অন্য ছবিতে মহিলাকে পূর্ণ বিকশিত করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ্যালবামের অন্য সকল মহিলার চিত্রায়ণ হতে। তার ব্যবহৃত অলংকারগুলো রাজসিক বৈশিষ্ট্যের। তার এক হাত শোভিত গাছের উপর এবং অন্যহাত নিজের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছেন। মহিলার পেছনে সাদা কড়া গন্ধযুক্ত ফুলের গাছ। যদিও সাদা রঙ সকলের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছবির মহিলাকে যথাসম্ভব দারাশিকোহ এর মাতা মমতাজ মহলকে বোঝানো হয়েছে। মমতাজ মহল ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে বোরহানপুরে তার চতুর্দশ সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। ছবিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বন্ধনি এটিই নির্দেশ দেয় যে ছবিতে যুবরাজ নিজেও কাজ করেছেন তার মায়ের শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকে। ফলে যুবরাজ তার চিত্রশালার প্রতি কতটা

আবেগি ও স্থির দৃষ্টি নিবন্ধিত রাখতেন তারও একটি প্রমাণ এখানে মেলে। এ্যালবামটি অন্য একটি কারণে বিখ্যাত তা হোল- পাখি ও ফুলের নিখুত ও চমৎকার চিত্রায়নের জন্য। আর ছবিতে পাহাড়গুলোকে শোভিত করা হয়েছে সোনালী ফুল দ্বারা।

ফুল ও পাখির চিত্র (Add Or 3129 f.9v-1500) : 'কালো ঝুটিওয়ালা রাত্রিকালীন সারস জাতীয় পাখি লিলি ফুলের সাথে' (ছবি নং ৫.১১)। সময়কাল ১৬৩০-৩৩ খ্রিষ্টাব্দ এবং বৃটিশ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত। এই চিত্রটিতে পাখিটাকে মধ্যম আকারে দেখানো হয়েছে। পাখিটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে দেখা যায়। এই জাতীয় সারস পাখির মাথার ঝুটি কালো এবং মেরুদন্ড কালো আর শরীরের অন্য অংশ সাদা ও ধুসর রঙ, এদের চোখগুলো লাল এবং হলুদ। অপেক্ষাকৃত স্থুল হওয়ার কারণে এর ঠোট দুটো ছোট আর পা ও গলা এই জাতীয় অন্য অঞ্চলের পাখির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এরা যখন বিশ্রামে থাকে তখন অনেকটা কুজো হয়ে থাকে আর শিকার ধরার সময় গলা লম্বা করে অনেক দূরের জিনিষকেও দেখতে পারে। এই পাখিগুলো পানিতে নিশব্দে দাড়িয়ে থাকে পানিতে থাকা কীট-পতঙ্গ শিকারের জন্য এবং তা প্রধানত রাত্রে এবং খুব প্রত্যুষে। এই সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত সারসের ছবিতে বিদ্যমান আছে । এ্যালবামে ব্যবহৃত বা চিত্রিত ফুল ও ফুলেল নকসা এবং এগুলোর অঙ্গসজ্জা মোগল বস্ত্রশিল্প ও স্থাপত্য শিল্প অলংকরণ হতে উদ্ভুত। আর ছবিতে ব্যবহৃত লিলি ফুলের ব্যবহার মোগল ইতিহাসের প্রকৃতির অংশ হতে উদ্ভুত।

৫.১১ মনসুর, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৬৪৫ খ্রি:

বাদশাহ শাহজাহানের আমলের চিত্রকলা মূলত *'মুরাক্কা'* নির্ভর ছিল । এই সময়ে পান্ডুলিপি চিত্রের সংখ্যা কমে যায় । তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের ন্যায় তিনি *'মুরাক্কা'* তৈরীর ঐতিহ্য গড়ে তোলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোহ তাঁর সুষমামন্ডিত *'মুরাক্কা'* 'Dara Shikoh Album' এর জন্য বিখ্যাত । *'মুরাক্কা'* তৈরীর পরম্পরা পরবর্তী মোগল শাসকগণ ধরে রাখেন যে কারণে আমরা কোম্পানি ও বৃটিশ রাজ আমলে সংগ্রাহকদের হাতে বহু মোগল *'মুরাক্কা'* পাশ্চাত্য জগতে দেখতে পাই । উল্লেখ্য

মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনামলে এই উপমহাদেশে মোগলদের যে উচ্চমানের সংস্কৃতি ছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মোগল চিত্রকলা (miniature) এবং চিত্র ও ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত *'মুরাক্কা'* যা মোগল শাসকদের ইতিহাস সচেতন ও মনণশীলতার পরিচায়ক ।

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *মুঘল ভারতের ইতিহাস,* ঢাকা, ইতিবৃত্ত প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ২৫০

২. এ.কে.এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ : মোগল পর্ব,* ঢাকা, মেসার্স প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০২, পৃ. ১৩৫

৩. এ.বি.এম হোসেন, *ইসলামী চিত্রকলা,* ঢাকা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, পৃ. ১৯৮-১৯৯

৪. অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা* (প্রথম খন্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬, পৃ. ১২৪

৫. রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়, দরবারি শিল্পের স্বরুপ : মুঘল চিত্রকলা, কলিকাতা, থীমা প্রকাশনি, পৃ. ৭৬

৬. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত,* ১১৪

৭. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, মুসলিম চিত্রকলা, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৩৮২

৮. *প্রাগুক্ত,* ১১৪

ষষ্ঠ অধ্যায়
মোগল পরবর্তী মুরাক্কা

মোগল চিত্রকলার আলোচনার স্বার্থে আমরা যদি সাম্রাজ্যের পুরো সময়কালকে অর্থাৎ ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দুটি অংশে বিভক্ত করি তবে চিত্রকলার ক্রমবিকাশটি বুঝতে সহজ হবে । বস্তুত মোগল সম্রাটদের পূর্ণ শক্তি ও প্রভাব বলবৎ ছিল ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ আওরাঙজেবের জীবনাবসান পর্যন্ত । এই রাজবংশের ব্যাপ্তী ও প্রতিপত্তি তদানিন্তন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী শাসকগোষ্ঠি পারস্যের সাফাভী এবং অটোমান তূর্কি সাম্রাজ্যের চাইতেও উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হত । বাদশাহদের কীর্তি ও সামগ্রীক বিচার প্রশাসন নিয়ে মোগলদের নিজস্ব রচনাতে যেমন তার প্রতিফলন ঘটেছে তেমনি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এর বিষদ বর্ণনা রয়েছে । মোগলদের রাজদরবার শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমসাময়িক বিশ্বের এক নেতৃস্হানীয় স্হান দখল করে ছিল । পর্তুগীজ ধর্মজাযক ফাদার মনসারেট (১৫৩৬-১৬০১ খ্রি:), ইংরেজ বণিক পর্যটক উইলিয়াম হকিন্স (১৬০৮-১৬১১ খ্রি:), স্যার টমাস রো (১৬১৫-১৬১৯ খ্রি:), এডওয়ার্ড টেরি (১৬১৫ খ্রি:) প্রমুখ ভিনদেশীদের ভ্রমন বৃত্তান্তেও দিল্লীর ঐশ্বর্য বর্ণিত হয়েছে । তাছাড়া 'বাবুরনামা', 'তাজকিরাতুল ওকিয়াত', 'হুমায়ূননামা', 'আকবরনামা', 'আইন-ই-আকবরী', 'মুন্তাখাব উৎ তাওয়ারিখ', 'তবকতই আকবরী', 'তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরি', 'পাদশাহনামা', 'চাহর চামন', 'আলমগীরনামা' ও 'মাসির-ই-আলমগীরনামা'র মত বিখ্যাত রচনা সমূহ শাসকদের গুনকীর্তন ও সমালোচনায় পরিপূর্ণ ।[১] সুতরাং যদিওবা মোগল সম্রাটগণ ১৯শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন তথাপি ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী শাসকগণ কেবলমাত্র নামেই মোগল শাসক ছিলেন । ঐতিহ্য এবং জাকজমকতা ভিন্ন কেবল রুগ্ন একটি দেহকে তাঁরা বয়ে নিয়ে গেছেন । একদা মধ্য এশিয়ার তুর্কী তৈমুর লং এবং মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের রক্তের উত্তরসূরী জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবুর ভারতবর্ষে যে মোগল শাসনের গোড়াপত্তন করেন সেই বংশেরই শেষ শাসক আবুল মুজাফফর সিরাজ উদ্দীন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ গাজী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুকম্পায় প্রাত্যহিক জীবন যাপন করতেন এবং ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে রাজ্যহারা হয়ে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে পরিবার, আত্বীয় ও ভৃত্যদের নিয়ে রেঙ্গুনে চলে যেতে বাধ্য হন ।[২] ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন । আলোচিত অধ্যায়ে মোগল পরবর্তী '*মুরাক্কা*' বলতে বস্তুত লেটার মোগল পিরিয়ড (later Mughal Priod) অর্থ্যাৎ মোগলদের শেষ শাসকদের সময়কার '*মুরাক্কা*' বোঝানো হয়েছে ।

মোগল চিত্রকলা বাদশাহ বাবুর (১৫২৬-৩০ খ্রি:) থেকে শুরু করে বাদশাহ আওরাঙজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি:) পর্যন্ত চলতে থাকে । মোগল শাসনের শেষ অংশ অর্থাৎ আওরাঙজেবের মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ শাহ এর (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি:) সময় হতে বাহাদুর শাহ জাফর (১৮৩৭-৫৭ খ্রি:) পর্যন্ত প্রায় ১১৯ বছরের শাসনামল উল্লেখযোগ্য রাজকীয় পরম্পরার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্যনীয় । অধিকন্ত মোগল শাসক মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি:) এবং পারস্যের আফসারিদ শাসক নাদির শাহ (১৭৩৯ খ্রি:) এর মধ্যে নিয়তিনির্দিষ্ট আলোচনা সাংস্কৃতিক ও নৈতিকভাবে সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণুতার সাক্ষি হয়ে আছে । নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণ (১৭৩৯ খ্রি:) এবং তার সৈন্যদের দ্বারা মোগল শাসকদের আবাসিক স্থানগুলো ধংস করা এক নারকীয় তান্ডবলীলার সাক্ষী হয়ে আছে । মোগল শাসক মুহাম্মাদ শাহের (১৭১৯-৪৮খ্রি:) সময়কার কোন চিত্রকলার সন্ধান মেলেনি । ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ শাহের মৃত্যুর পর বহুমাত্রিক সমস্যার আবর্তে জড়িয়ে পড়ে মোগল শাসন তথাপি চিত্রকলা হতে দিল্লী একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি তখনও । রাজকীয় শান-শওকাতের ভাটা পড়ার এই সময়ে শিল্পীগণ কাজের সন্ধানে আঞ্চলিক প্রদেশগুলোতে যেমন অযোধ্যা (Awadh) ও মুর্শিদাবাদে তাদের কর্মক্ষেত্র করে নেন । এই সময় মোগল শিল্পীদের ধারণা ও শৈলীতে পরবর্তী মোগল শিল্পীগণ একটি দূর্যোগে আবর্তিত হন । যদিও বলা হয়ে থাকে যে- সংস্কৃতি কখনও এক যায়গাতে স্থির থাকেনা এবং তা রাজনীতিকে আবর্তন করেনা । সুতরাং মোগল শাসনের দূর্বলতার ইতিহাস অর্থ হোল দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা বৃদ্ধি । ফলে চিত্রকলার পৃষ্ঠোপোষকতা পরিবর্তন হয়ে আমত্যবর্গ ও ইউরোপিয় সাহেবদের কাছে চলে যায় ।

৬.১ গেনটিলের একটি চিত্র, বৃটিশ মিউজিয়াম, ১৭৯০ খ্রি:

এই ধারণার বশবর্তি হয়ে বলা যায় যে - জেন ব্যাপ্টিষ্ট গেনটিল (Jean Beptiste Gentil-১৭৬৪-৭৫) অযোদ্ধা এবং এনটোইন লুইস হেনরি পলিয়ার (Antoine Louis Henri Polier) দিল্লীতে ১৮শতকের শেষে চিত্রের দিকে নজর দেন । শাহ আলমের (১৭১৯-৪৮খ্রি:) রাজকীয় ছবিগুলো বভিন্ন ভঙ্গীতে

শাহজাহানাবাদে চিত্রিত হতে থাকে । ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মোগল শাসক শাহ আলমের রাজকীয় শিল্পী নিধা মাল (Nidha Mal, মৃত্যু-১৭৭২ খ্রী:)[৩] যিনি লাল কেল্লার ছবি চিত্রণ করেন তাকে গেন্টিল (Gentil) (ছবি নং ৬.১) ও পলিয়ার (Polier) সহযোগিতা করেন । নিধা মাল দিল্লী হতে অযোধ্যাতে চলে যান । এই সময় আফগানিস্তানের অধিপতি ও দুররানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ শাহ আবদালি (১৭৪৭-৭২ খ্রি:) দিল্লী আক্রমণ করেন । ৪২টি ফলিও (folio) সমৃদ্ধ একটি মানচিত্র অংকিত হয় "আইন-ই-আকবরি" হতে তবে তার অঙ্গসজ্জা করা হয় ইউরোপীয় শাসকদের মনোপুত তথ্য দিয়ে । চিত্রগুলোর মধ্যে নবাব সুজা উদ দৌলা ও গেনটিল হাতির পিঠে চড়ে সিংহ শিকার যাওয়ার দৃশ্যটিও উল্লেখযোগ্য ।

আর দ্বিতীয় উদ্যোগটি হোল কয়েক বছর পর শাহ আলমের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে মোগল রাজকীয় সংস্কৃতিকে নতুন ভাবে শুরু করা । এই এ্যালবামটিতে মোগল শাসকদের কার্যকলাপ ও বিচারালয়কে তুলে ধরা হয়েছে । প্রথম চিত্রটিতে মোগল সাম্রাজ্যের চিত্রটি শাহ আলমের নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে এবং বাদশাহ তার তখতে (takth) বসে আছেন । আর তার চারিদিকে প্রধান অমাত্যবর্গগণ বসে আছেন এবং তাদের ব্যবহার্য্য জিনিষ ও সঙ্গীতের যন্ত্রগুলো পড়ে আছে । আর দ্বিতীয় ছবিতে শাহ আলমের সিংহাসনে অধিষ্ঠানের চিত্র (ছবি নং ৬.২) । এই রিকুইলটি (Recueil) দূর্লভ একটি প্রামাণ্য যেখানে শাহ আলমের রাজত্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ । নিভাসি লাল (Nivasi Lal) এবং মোহন সিং (Mohan Sing) যারা অযোধ্যা নবাব সুজা-উদ-দ্দৌলা ও ইউরোপীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এটি করতে পেরেছিলেন । নিভাসি লাল প্রতিকৃতি অংকনে পারদর্শি ছিলেন । তিনি তেল রঙে আঁকা ইউরোপিয় চিত্রকর টিলি ক্যাটেল (Tilly Kettle) এর সুজা-উদ-দ্দৌলার চিত্র যা ফয়েজাবাদে ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে

৬.২ শাহ আলম দ্বিতীয়, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, Wikipedia, ১৮৪০ খ্রি:

অন্কিত হয়েছিল তার অনুলিপি তৈরী করেন । চিত্রকর মোহন সিং ছিলেন গোবর্ধন দ্বিতীয় (Govardhan) এর পুত্র যিনি মোগল শিল্পী ছিলেন । ছবিটি উল্লেখিত শিল্পী দ্বয়ের নামে উৎসর্গ করা হয় । এই এ্যালবামে আরও যারা কাজ করেছিলেন তারা হোলেন শীতল দাশ, গোবিন্দ সিং এবং গোলাম রেজা ।[৪]

বার্লিন পলিয়ার এ্যালবাম

৬.৩ Peacock Throne, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, Wikipedia সংগৃহীত, ১৮৫০ খ্রি:

১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বৃটিশ সামরিক স্থপতি পলিয়ার (Polier) ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ ওবং চূনার দূর্গ স্থাপনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন । তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ হতে জানা যায় যে, তিনি চাকুরিকালীন সময়ে দিল্লীতে অনেক চিত্রকরকে আমন্ত্রণ জানান । তার মধ্যে মহির চাঁদ (Mihr Chand) অন্যতম যিনি আরও শিল্পী সহ দিল্লীতে পলিয়ারের আমন্ত্রণে আসেন এবং তাদের সাথে অনেক চিত্র ও এ্যালবাম ছিল যা বর্তমানে বার্লিন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে । এর মধ্যে ‘শাহ আলম ২য়’ শিরোনামের ছবিটিতে রোদ নিবারক ছাতা ও বাদশাহের হাতে পবিত্র কোরআনের ছবি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ভাবে চিত্রিত হয়েছে । এই এ্যালবামের অপর একটি অনুলিপি লস এ্যান্জেলস মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ‘The Emperor Shah Alam on the Peacock Throne’ (ছবি নং ৬.৩) শিরোনামের চিত্রটি শিল্পী খাইরুল্লাহ (Khairullah) এর অমর কীর্তি । শতাব্দির শেষ সময়ে চিত্রিত এটি উল্লেখযোগ্য একটি প্রতিকৃতি চিত্রণ । বলা হয়ে থাকে খাইরুল্লাহ সমসাময়িক ‘রাগমালার’ চিত্রকর মোহাম্মদ ফকিরুল্লাহর (Fakirullah, ১৭২০-৭০ খ্রি:) বন্ধু ছিলেন ।

আকবর শাহ (১৮০৬-১৮৩৭ খ্রি:) যখন মোগল সিংহাসনে বসেন তখন রাজকীয় ভাবগাম্ভির্যতা ও জৌলুস অনেকটাই ভাটা পড়েছে । ঐ সময় কৌতুক করে বলা হোত যে – ‘শাহ আলমের দিল্লী কেবলমাত্র পালাম পর্যন্ত বর্ধিত ছিল, আর আকবর শাহের দিল্লী তার চাইতেও ছোট ছিল’ (Shah Alam’s Delhi only extended to Palam, Akbar Shah’s Delhi was ever

smaller) । এটা রাজকীয় বিশেষ সম্পত্তি যা নাজুল (Nazul) এবং তাইয়ুল (Taiul) দ্বারা ঘোষিত । আর এখানে কেবলমাত্র দিল্লী রাজপ্রাসাদ ও পার্শবর্তী এলাকা যা আকবর শাহের দখলে ছিল । অধিকন্তু ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে এ্যাংলো-মারাঠা যুদ্ধের পর বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবগণ মোগল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সংকুচিত করে কেবলমাত্র দিল্লীতে তাদেরকে বেতনভুক করে রাখে । এই সময় কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয় যে - আকবর দ্বিতীয়কে তারা এক লক্ষ রুপি করে বরাদ্দ দেবেন যার মধ্যে ৭ হাজার রুপি ব্যবহার বা উপভোগের উপযোগি । মোগল শাসনের শেষের দিকে বাদশাহদের ব্যক্তিগত ভাতা ৮২,২০০ রুপি ছিল ।[৫] ফলে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দৈন্যতায় পড়ে বাবুরের উত্তরাধীকারগণ । এই সময় দিল্লীতে গোলাম মর্তুজা খান তার চিত্রাংকন ও প্রতিকৃতি অংকনে খাইরুল্লাহকে অনুস্মরণ করেন । লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো এই সময় মোগল শাসকদের সাথে বৃটিশদের যে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল তার খানিকটা রাজকীয় চিত্রকরগণ অনুস্মরণ করতেন বিশেষত গোলাম মর্তুজা খানের মত শিল্পীগণ ।

মোগলদের এই সময়কার ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিকাশে দুইটি যোগাযোগ মাধ্যমের উপর আমরা নির্ভরশীল । প্রথমত-'দিল্লীতে বৃটিশদের আবাসিক অফিস এবং কোম্পানির প্রশাসনিক কেন্দ্র যা ফোর্ট উইলিয়াম (Fort William) কলিকাতাতে অবস্থিত তাদের মধ্যকার অফিসিয়াল যোগাযোগের তথ্য যা এ্যাংলো-মোগল বলে খ্যাত । আর দ্বিতীয়ত- আখবারাত (Akhbarat) নামক মোগলদের দরবার হতে প্রকাশিত বৃটিশদের জন্য পত্রিকা' ।[৬] এই পত্রিকাটি ফার্সি ভাষায় লিখিত এবং ১৬শতক হতে পত্র অথবা পত্রের বক্তব্য সংক্রান্ত মোগল যোগাযোগের বিশেষ মাধ্যম বলে বিবেচিত । এই দুই যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা জানতে পারি (১৮১০-১৮২৫ খ্রি:) আকবর দ্বিতীয় এর সময় দুই ধরণের চিত্রাংকন বিকশিত হয় । প্রথমটি হোল- দরবারি প্রতিকৃতি আকবর শাহের এবং দ্বিতীয়ত- শাসকের অর্ধ-বার্ষিক মিছিলের ক্রমাগত চলমান দৃশ্য । চিত্রকর গোলাম মর্তুজা খানের[৭] (তাঁকে এই যুগের বিস্ময় এ বিহযাদের সমকক্ষ শিল্পী বলা হয়েছে) চিত্রিত 'আকবর দ্বিতীয় দরবারে' ছবিতে আকবরকে তার দুই পুত্র সহ দরবারে দেখা যাচ্ছে । গোলাম মর্তুজার স্বাক্ষরিত ছবির সময় হোল আকবরের রাজত্যের চতুর্থ বছর । আর দ্বিতীয় ছবিটি হোল পরিবার পরিজনসহ কোন বিশেষ উপলক্ষ্য কে সামনে রেখে একত্রিত হয়ে সকলেই মিলে সেই ক্ষণটি উপভোগ করছে । উভয় ছবিই বিখ্যাত চিত্রকর খাইরুল্লাহর চিত্র চর্চার রচনা কৌশল ও গুণের স্পষ্টত পরিচয় তুলে ধরে । এই সময় 'পাদশাহনামা' নামে অন্য একটি '*মুরাক্কা'* বা এ্যালবাম চিত্রিত হয় । গোলাম মর্তুজার মতে-'পাদশাহনামা' হোল ১৯ শতকের পান্ডুলিপির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেননা, চিত্রকরগণ এই পান্ডুলিপির মাধ্যমেই তাদের পেশাগত বৈচিত্রতা তুলে ধরেন ।

আকবর দ্বিতীয় এর পান্ডুলিপিটি ছয়টি আলাদা শোভাযাত্রার ছবির সংগ্রহ বা এ্যালবাম । লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এন্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত ছবিগুলো ১৮৪০-৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই চিত্রিত । চিত্রকর দিল্লীর মাজহার আলি খান (Mazhar Ali Khan, ১৮৪০-৫০ খ্রি:)। চিত্রকর মোগল শোভাযাত্রার ছবিটি অত্যন্ত নিপুন হাতে আকবরের ছবিকে বড় করে প্রকাশ করেছেন । তথাপি বাহদুর শাহ জাফর (১৮৩৭-৫৭ খ্রি:) ও কোম্পানি কর্মকর্তা থমাস থিয়োপিলাস মেটকাফ (Thomas Theophilus Metcalfe, ১৭৯৫-১৮৫৩ খ্রি:) ছবিতে তাদেরকে আরও বাস্তব অবস্থার নিরিখে আঁকা হয়েছে । এটি দিল্লীর চিত্রকারখানার একটি প্রকৃতিঘেষা বাস্তবধর্মী বৈশিষ্টাবলী সমৃদ্ধ এ্যালবামগুলোর পর্যায়ভূক্ত ।[৮] এটি আলোয়ার (Alwar) এর মহারাজার ব্যক্তিগত সংগ্রহ । চিত্রকর গোলাম আলী খান (Ghulam Ali Khan, ১৮১৭-১৮৫৫ খ্রি:) যখন আলোয়ার সভাসদে কাজ করতেন তখনকার চিত্রণ । গোলাম আলীর এই চিত্রে তার নিজস্ব ভঙ্গীমা ও স্থাপত্যের প্রতি তাঁর প্রেমান্ধতার পরিচয় বহন করে । এক সময় এই ছবিটি যমুনা নদীর দৃষ্টি নান্দনিকতার প্রেক্ষাপটে আঁকা হোলেও গোলাম আলীর ছবিটিতে লাল কেল্লার দৃশ্যপটটি সংযুক্ত হয়েছে । ছবিতে রাজকীয় হাতিগুলোকে পানিতে আনন্দচিত্যে খেলতে দেখা যাচ্ছে আর মানুষগুলোকে তাদের নিজের কাজে মগ্ন থাকতে দেখা যাচ্ছে ।

চিত্রকর গোলাম আলী খান পাঁচ দশকের উপর বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় (১৮০৬-৫৭ খ্রি:) মোগল দিল্লীতে চিত্রচর্চা শুরু করেন । তবে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে 'দিওয়ানে খাস' এর চিত্রে তার স্বাক্ষর চোখে পড়ে । এই সময় থমাস ডেনিয়াল (Thomas Daniell, ১৭৪৯-১৮৪০ খ্রি:) নামক চিত্রকর ও স্থাপত্য কর্মের নক্সা প্রণয়নকারী ব্যক্তিকেও বিষেশভাবে উল্লেখ্য । ডেনিয়ালের প্রাজ্ঞতা স্থানীয় শিল্পী, নক্সা প্রণয়নকারী ও ইউরোপিয় চিত্রকর প্রভৃতিদের মধ্যে একটি মেল বন্ধন তৈরী করেন (ছবি নং ৬.৪) । গোলাম আলী তাঁর সর্বশেষ একটি রাজকীয় এ্যালবাম যা মোগল শাসক বাহাদুর

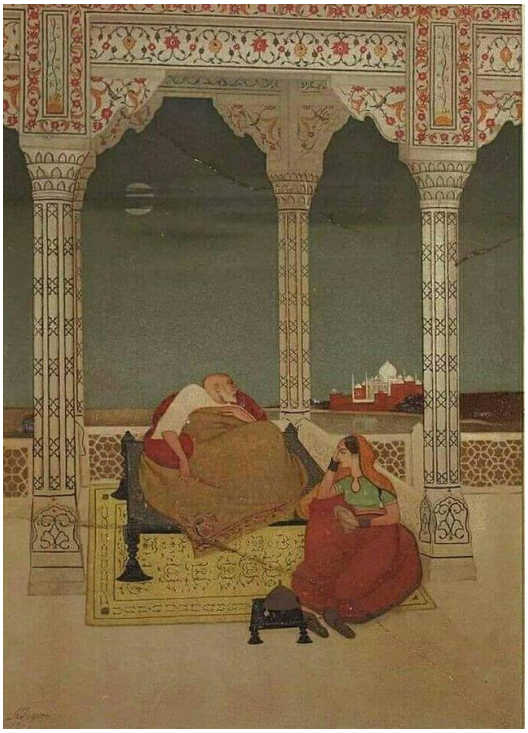

৬.৪ বাহাদুর শাহ জাফর, অবনিন্দ্রনাথ, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, Wikipedia, ১৮৫০ খ্রি:

শাহ জাফরের জন্য তৈরী করেছিলেন (১৮৫২ খ্রি:) যেখানে প্রমাণিত হয় তিনি ৭০/৮০ বৎসর এই কাজেই নিমগ্ন ছিলেন। বোনহামাস্ (Bonhams) ইসলামিক এন্ড ইন্ডিয়ান আর্ট (Islamic & Indian Art) লন্ডনে এর একত্রিশটি চিত্র সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে (Lot no-৩৫২)।[৯] এর মধ্যে দুইটি চিত্র ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের। একটি 'কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ' অন্যটি 'কুতুব মিনার'। গোলাম আলীর দুই পুত্র মাজহার আলী খান (১৮২৫-৪০ খ্রি:) ও মির্জা শাহরুখ বেগ (১৮৪০ খ্রি:) বাবার সাথে বেশ কিছু কাজও করেন। এমন একটি ছবিতে আকবর দ্বিতীয় এর ছেলে মির্জা সেলিম এর প্রতিকৃতি দেখা যায় যেখানে ডান হাতে হুক্কা (Huqqa) ধরা অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ জাফর উর্দু কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিবকে মোগলদের রাজকীয় ইতিহাস লেখার তাকিদ দেন। গালিবের বন্ধু হালি (Hali) 'গালিব স্মরণে' (Memoir of Galib) যে কাজটি করেন তার শিরোনাম দেন 'পারতাবিস্তান' (Partawistan) বা 'The land of Radiance'। এটাকে দুটি অংশে/খন্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রথম খন্ডটি পৃথীবি সৃষ্টি হতে বাদশাহ হুমায়ূন (১৫৫৬ খ্রি:)পর্যন্ত বিস্তৃত যার শিরোনাম 'মিহির-ই-নিমরোজ' (Mihir-i-Nimroj) বা মধ্য গগণের সূর্য্য যা ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আর দ্বিতীয় খন্ডটি অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে এবং সম্ভবত বাদশাহ আকবর হতে বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত যার শিরোনাম 'মাহ-ই-নিম্মাহ' (The Sun at Mid-month) বা মধ্য মাসের সূর্য। সান দিয়াগো জাদুঘর (Sun Diago Museum of Art) এ রক্ষিত হাকিম আহসান উল্লাহ খানের এই সংগ্রহ দুটি শেষ মোগল শাসকদের চিত্রকলার এক অনন্য নজির।[১০] এখানে মোগল শাসকদের জন্ম, মৃত্যু, তাদের প্রতিকৃতি, তাদের কবর ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এগুলোকে সংকলন করেছেন মুহাম্মদ ফকরুদ্দীন হুসাইন বেগ (Muhammad Fakhrudidin Husain Beg)। রেকর্ডপত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায় এই তালিকাটি মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ খানের তত্ত্বাবধানে চিত্রকর গোলাম আলী খান ও বাবর আলী খান চিত্রায়ন করেন। বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে- *'মুরাক্কা'টিতে* অ-মোগল শাসকদের প্রতিকৃতিও রয়েছে। যেমন শের শাহ ও তার পুত্র সেলিম শাহ, শাহ তাহমাসপ, নাদির শাহ, আহমেদ শাহ দুররানি এবং তার পুত্র তিমুর শাহ।

উল্লেখ্য সাম্প্রতিক গবেষণাতে দেখা গেছে যে, লেখক ও ঐতিহাসিক সাইয়্যেদ আহমেদ খান ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে আসেন এবং সম্ভবত 'আসার আল সানাদিদ' (Asar al-Sanadid) নামের পান্ডুলিপিটির চিত্রিত এ্যালবাম তিনটি পর্যায়ে তার পারিবারিক ছাপাখানা হতে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই সময় আহমেদ খান আগ্রার ফতেহপুর সিক্রীতে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

আলোয়ার গুলিস্তান :

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে গোলাম আলী খান আলওয়ারের মহারাজা বান্নি সিং (Banni Singh) এর তত্ত্বাবধানে সাদির অমর কাব্য 'গুলিস্তান' পান্ডুলিপিটি সম্পাদনা করেন । এই কাজটি হোল পারসো-ইউরোপিয় শৈলীতে চিত্রায়িত যা তখন দিল্লীর চিত্রশালাগুলোতে চর্চা করা হচ্ছিল সেই রকম একটি কর্মকান্ড ।[১১] এই কাজের মত তখন প্রাদেশিক রাজ্যগুলোতে যেমন আলওয়ার এবং ঝাজর (Jhajjar) এ এই ধরণের কাজ চলছিল । আগা মির্জা কর্তৃক হস্তলিখনের মাধ্যমে বারো বৎসরে এই কাজ করা হয় যেখানে প্রত্যেক পৃষ্ঠার জন্যে ব্যয় করা হয় পনের দিন । দিল্লীতে কর্মরত শিল্পী যথাক্রমে নাথা শাহ পান্জাবি (Natha Shah Panjabi) এবং করিম আব্দুল রহমান (Karim Abdul Rahman) এর অঙ্গসজ্জা, চিত্রণ, গোলাকার নক্সা আর জটিল সব কাজগুলো দু'চার দিন সময় ব্যয় করে করেন । করিম আব্দুল রহমান এই পান্ডুলিপিটি এ্যালবাম আকারে বাঁধাই করে । আর গোলাম আলী খান আলওয়ারের অপর শিল্পী বেলদেভ (Beldev) কে দিয়ে সতেরটি ইলাসট্রেশান ও ২৮৭ পৃষ্ঠার তথ্যবহুল এই পান্ডুলিপিটি তৈরী করেন (১৮৪০-১৮৪৯ খ্রি:)।

আলোয়ারের সংগ্রহ ফ্রেজার এ্যালবাম :

এই সময় উইলিয়াম ফ্রেজার (Willium Fraser) এবং জেমস স্কিনার (James Skinner) 'দিল্লী কলম' বা ঘারানার দু'দশক পূর্বে আলোয়ারের চিত্রকরদের নিয়ে গোলাম আলী খানের সংগ্রহে যে চিত্রকর্মগুলো তাদিয়ে ফ্রেজার এ্যালবাম (Fraser Album) নামে একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন । এখানে ক্রমানুসারে পবিত্র ব্যক্তি ও ফকির সন্ন্যাসি এবং একক খ্যাতনামা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি ও প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক চিত্র প্রকাশ করা হয় । এই এ্যালবামটি ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে

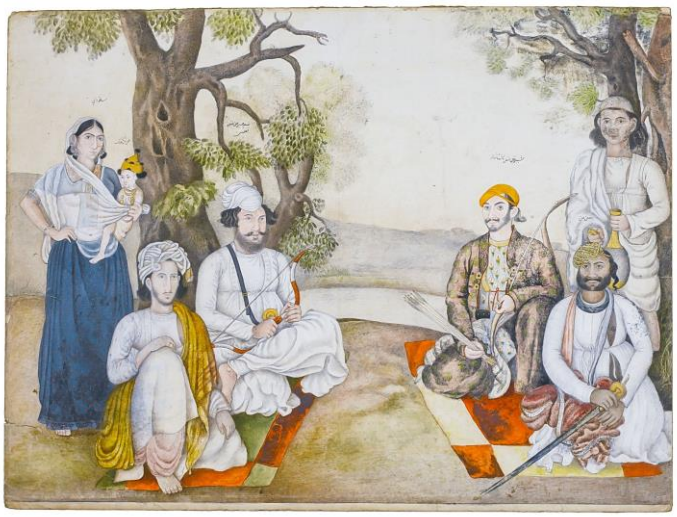

৬.৫ ফ্রেজার এ্যালবাম, গোলাম আলী খান, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ১৮৪০ খ্রি:

আলোয়ারে নওয়াব আহমেদ বখশ্ খান যিনি উইলিয়াম ফ্রেজারের বাণিজ্যিক বন্ধু ছিলেন তার মাধ্যমে প্রদেশের বিচারালয়ে প্রকাশ করা হয় । এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হোল যে- আহমেদ বখশ খান আলোয়ারের রাজা বখতাওয়ার সিং (Bakhtawar Singh) এর একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন । মোগল দরবারের প্রতিনিধি হিসেবে নওয়াবদের এই কাজের সহযোগিতা ও সমর্থন যোগানের জন্য বলওয়ান্ত সিং (Balwant Singh) আলোয়ারের দরবারে ছিলেন । ফ্রেজার তাঁর এ্যালবামের প্রতিকৃতিগুলি দিল্লীর স্থানীয়দের এবং জনপ্রিয় ব্যাক্তিদের দিয়ে তৈরি করেছিলেন যারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকর হিসেবে কাজ করতেন । বস্তুত এই ধরণের কর্মকান্ড ‘পারসো-ইউরোপীয়’ চিত্রকলা হিসেবে পরিচিত (ছবি নং ৬.৫)।

আলোয়ারের চিত্রটি যা দিল্লীতে আঁকা হয় তা হোল- ‘সাত জন সন্নাসী ও প্রতিনিধি’ (Seven Ascetics and an Attendant) । এই ছবিতে সরধাজ (Sardhaj) কে তার অনুসারী রাম ধানী (Ram Dhani) সহ দেখা যাচ্ছে এবং একই সাথে তাঁকে একটি রোদ নিবারক ছাতা হাতে অন্যান্য সন্নাসীদের সাথে/কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে । বামের একটি দূরবর্তী যায়গাতে একজন ব্যক্তিকে দেখানো হচ্ছে একটি বই হাতে । তিনি দাড়িয়ে আছেন তার নিকটবর্তী একজন লোকের সাথে যিনি পাঁচটি বানর ও তিনটি কুকুরকে সাহচার্য দিচ্ছেন । তাদের সম্মুখে একজন সন্নাসী দাড়ানো যিনি একটি লম্বা পাগড়ী পরিহিত এবং জাফরান রঙ বিশিষ্ট কোমরবন্দ যুক্ত ঢিলা পোশাক আবৃত এবং তার হাতে লাঠি । কেন্দ্রীয় অবস্থানে তিনজন সন্নাসীকে দেখা যাচ্ছে ।[১২] ভিক্টোরিয়া এন্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত এই ছবিটি ফ্রেজার (Fraser) এ্যালবামের অন্তর্ভূক্ত যেখানে আলোয়ারের চিত্রকরগণ কাজ করেছেন ।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাণী ভারতের সম্রাজ্ঞী হন । শেষ মোগল সম্রাটের নির্বাসনের পর দরবারগুলো কেবলমাত্র পূর্বসূরীদের প্রতীক হিসেবে টিকে থাকে । এর নান্দনিকতা ও শিল্পমান বদলে যায় । যদিওবা মোগল বাদশাহ আওরাঙজেবের গোঁড়ামি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কাল এর জীবন শক্তি প্রবাহমান থাকে তথাপি অভাববোধ হয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং অর্থের । অর্থ এবং সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ ব্যাতিরেকে নান্দনিক কোন শিল্প চর্চা সম্ভবপর নয় । যে সকল আমত্যবর্গ ও অর্থবান এই খাতে রাজানুগ্রহের প্রত্যাশায় লগ্নি করতেন তারা ভবিষ্যত সম্ভাবনা না থাকায় শিল্প চর্চায় তাদের হাত গুটিয়ে নেন । ফলে দরবারী ওস্তাগর, শিল্পী, সাহিত্যিক ও কলাকুশলীগণ প্রায় সকলেই কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং নিজেদের জীবিকার তাকিদে রাজধানী ছেড়ে আঞ্চলিক শাসক ও ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্দোক্তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন । ফলে শিল্পী ও শিল্পকর্ম বাজারী সস্তা পেশায় পরিণত হয় ।[১৩]

উনিশ শতকের এই সময় বৃটিশরা কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে তিনটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কোন নান্দনিক শিল্প বা শিল্পী সৃষ্টি নয় বরং তা ছিল সার্ভের ড্রয়িং এবং ক্ষেত্র বিশেষে ড্রাফটসম্যান তৈরী করা। বৃটিশদের মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মেকেলের একটি মিনিটস্ থেকে। সেখানে বলা হয় 'ভারতীয়দের শুধু গায়ের রঙ ছাড়া হতে হবে পুরো ইংরেজ'।

প্রসঙ্গত ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে নাদির ইমাম কুলি খান সাফাভি বংশের শেষ সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে 'নাদির শাহ' উপাধি ধারণ করে পারস্যের সিংহাসনে বসেন। পারস্যের দূতকে মোগল দরবারে আটকে রাখার প্রতিবাদে ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের অদূরবর্তী 'কার্ণাল' নামক স্থানে মোগল সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের চাইতে তাঁর যে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রক্রিয়া তা ইতিহাসকে থমকে দেয়। তিনি বর্বরোচিত হামলা করে শুধু দিল্লীতেই দেড় লাক্ষের মত সাধারণ জনতাকে হত্যা করে। দালান-কোঠা, ইমারত, হাট-বাজার ও জনপদ বিধ্বস্ত করেন।স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় প্রচুর অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মুক্তা, ভুবন বিখ্যাত 'ময়ূর সিংহাসন' এবং 'কহিনুর' মণি লুন্ঠন করে নিয়ে যান। উল্লেখ্য, লুন্ঠনের তালিকায় বহু মূল্যবান পুঁথি, চিত্রকর্ম ও মোগলদের সংগৃহিত এবং প্রস্তুতকৃত *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবাম স্হান পায়। নাদির শাহের এই কর্মকান্ডকে কেবল হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের সাথেই তুলনা করা য়ায়। এই আক্রমণ কেবলই আক্রমণ নয় বরং প্রায় আড়াই শত বছরের শিল্প-সংস্কৃতিকে শুন্য করে দেয়া হয়। লুন্ঠনের পরও যে সকল মূল্যবান চিত্রাবলী থেকে যায় তার মধ্যে গোবর্ধনের আঁকা একটি ছবি এবং 'কারনামা-ই-ইশক' নামক ৩৭টি মিনিয়েচার সম্বলিত একটি পূঁথি থেকে যায় যা পরবর্তীতে জনসন সংগ্রহে সংগ্রহভূক্ত হয়।

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ই. বি হ্যাভেল কোলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। জাতিতে ইংরেজ হোলেও ভারতীয় সংস্কৃতিকে সম্মান করা তাঁর রক্তে মিশে ছিল। কেননা তিনি দেখেছেন কিভাবে ভারতীয় ধ্রুপদি ছবিগুলোকে কেবলমাত্র ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে-সাথে তাকেও আস্তাকূড়ে নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং পরিবর্তে সস্তা দরের ইউরোপিয় ছবি ইংরেজরা সম্মুখে নিয়ে আসছেন। এই দু:খবোধ থেকেই হয়তবা হ্যাভেল ভারতিয় ছবির যে অমূল্য অংশগুলো বর্তমান রয়েছে তার প্রদর্শনের ব্যবস্হা করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ওস্তাদ মনসুরের চিত্রায়িত জীবজন্তুর ছবি। অধুনা হ্যাভেলের প্রদর্শিত ছবিগুলো দিয়েই ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের গ্যালারী সজ্জিত হয়েছে। দায়িত্ব প্রাপ্তীর এই পর্যায়ে তিনি যে সকল আদি মোগল ঘারানার চিত্রকর জীবিত ছিলেন বিষেশত কাজের অভাবে অন্য পেশাতে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। বলা বাহুল্য তখন

মোঘল চিত্রের অনেক শিল্পী সাহেবদের প্রিন্টিং প্রেসে কাজে নিয়োজিত ছিলেন । বস্তুত সৎ উদ্দেশ্য কখনও বিফলে যায়না ।তার প্রমাণ হোল হ্যাভেলের আবিস্কার লালা ঈশ্বরী প্রাসাদ । এই চিত্রকরের পূর্বপুরুষগণ মুর্শিদাবাদ দরবারের রাজকীয় শিল্পী ছিলেন । আমরা জানি ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীন নবাব মুর্শিদ কুলী খান তাঁর রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদের লালবাগে প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁর মৃত্যুর পর আলিবর্দি খান ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন । এমনকি ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর বিপর্যয়ের পরও ইংরেজগণ নবাবদের শাসনে তেমন হস্তক্ষেপ করেনি । ফলে শিল্পীগণ অনেকটা নিশ্চিন্তে তাদের শিল্পচর্চা করেছেন । বলা যায় যে - পুরো আঠারো শতক ধরেই মুর্শিদাবাদ হিন্দু ও মুসলমানদের মহররম ও খাজা খিজিরের উৎসবের জাকজমকতায় পরিপূর্ণ থাকত । চিত্রকরগণ মুসলিম বিষয়বস্তুর পাশাপাশি হিন্দু বিষয়বস্তু বিশেষত রাগমালা চিত্র এবং তন্ত্রঘেষা দেবদেবীর চিত্র আঁকতেন । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই সময় লক্ষণৌ থেকে বিখ্যাত মোগল শিল্পী হুনহার মুর্শিদাবাদে আসেন ।[১৪] ফলে মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর চিত্রাংকনের বড় একটি কারখানা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে । প্রমাণ রয়েছে এই কারখানাতে ইংরেজ সাহেবদের প্রতিকৃতি অংকন করিয়ে নিতেন । এমন চিত্রের সম্ভার ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে যার মধ্যে উইলিয়াম ফুলারটন এর প্রতিকৃতি চিত্র যার শিল্প হোলেন দীপচাঁদ (ছবি নং-৬.৬) । যাই হোক, ইংরেজদের কোন কোন সাহেব মোগল চিত্ররীতিকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন ।

৬.৬ উইলিয়াম ফুলারটনের প্রতিকৃতি, দিপ চাঁদ, মুর্শিদাবাদ যাদুঘর, ১৭৬০ খ্রি:

উল্ল্যখ্য, এই লালা ঈশ্বরীপ্রাসাদ থেকেই মোগল চিত্রকলার কলাকৌশল শিক্ষা নেন আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম চিত্রকলার পথিকৃত অবনিন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি মুসলিম চিত্রকলা বিরোধী মনোভাবাপন্ন ইংরেজ সাহেবদের কর্মকান্ডকে নিন্দা করে এর প্রতিবাদ করেন ।তারই নেতৃত্বে মোগল থীম নিয়ে আঁকা হোল ‘মৃত্যুপথযাত্রি শাহজাহান’ এবং ‘তাজমহলের পরিকল্পনায় মোগল বাদশাহ’, ও ‘দারার ছিন্ন মস্তকের সামনে দন্ডায়মান আওরাঙ্গজেব ও জেবউন্নিসা’ ।

চিত্রশিল্পে দিল্লীর অবস্থা কতটা নাজুক ছিল তার প্রমাণ মেলে দিল্লী দরবারের মারাঠা দূতের একটি পত্র থেকে। হিন্দু দেব-দেবীর উত্তম ছবি আঁকার মত কিছু শিল্পী দিল্লীতে পাওয়া যাবে কিনা মহারাষ্ট্র দরবার থেকে জানতে চেয়ে প্রতিউত্তর মেলে যে- দিল্লীতে ভাল হিন্দু চিত্রকর পাওয়া যাবে না। কারণ ইতোমধ্যে দিল্লীতে কাজের অভাবে অধিকাংশ চিত্রকরই লক্ষনৌ ও অন্যান্য আঞ্চলিক শহরগুলোতে চলে গেছেন।[১৫] তাই মোগলদের ক্ষয়িষ্ণু সময়ে যে সকল চিত্র মোগল দরবার বা তাদের অমাত্যবর্গদের নামে চালিয়ে দেয়া হয় তা এক ধরণের প্রতারণা বা সত্যকে মিথ্যায় প্রকাশ করা। এতদ্বসত্ত্বেও মোগল শাসক দ্বিতীয় আকবর শাহ এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ এর শেষ সময় (১৮৫৮ খ্রি:) পর্যন্ত কিছু কিছু শিল্পী দিল্লীতে তাঁদের পেশায় সম্ভাব্যহীনতা নিয়েই পড়ে রইলেন। এই শিল্পীদের মধ্যে একজন প্রতিথযশা শিল্পী ছিলেন তিনি হোলেন গোলাম মর্তুজা খান। উল্লেখ্য যে, এই সকল চিত্রকর্মগুলো কিছুটা বিচ্ছিন্ন এবং পাঁচমিশেলী টাইপের। ফলে শাসন ব্যাবস্থার অধ:পতনের সাথে সাথে শিল্প-সংস্কৃতিরও অধ:পতন শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে মোগল পরবর্তীতে 'মুরাক্কা'র যে প্রসার তা মোগলদের সময়কালীনই রুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে 'ফররুখশিয়ার' এর রাজত্যকালে 'বাঙ্গাশ' উপজাতির নেতৃত্বে অনেক শাসকের প্রতিকৃতি চিত্রিত হয় (ছবি নং-৬.৭)। শিরনোমহীন এই একটি 'মুরাক্কা' ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেকটি মিনিয়েচারের উল্টোপিঠে একটি করে 'রাগমালার' ছবি চিত্রিত আছে। ইন্ডিয়া অফিসের অন্য একটি সংগ্রহ 'জনসন এ্যালবামে' সমসাময়িক কালের কিছু চিত্রেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

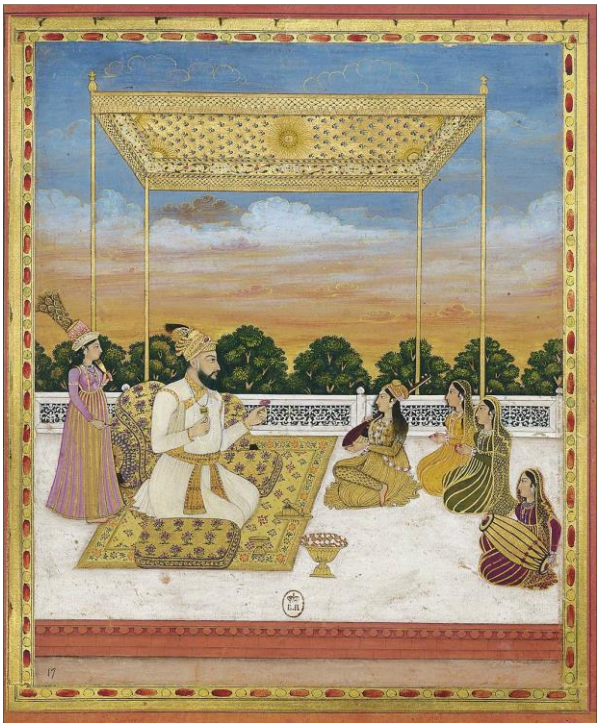

৬.৭ মুহাম্মদ খান বঙ্গাস, লেটার মোগল, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ১৭১০ খ্রি:

প্রসঙ্গত,ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে রাজ্য বিস্তারের সাথে-সাথে শাসকদের সংস্কৃতি চর্চার ডালপালা ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্থানীয়ভাবে চিত্রকলার চর্চা হয়েছে। ৭৫০ খৃিষ্টাব্দে রাজা গোপালের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পাল বংশের সময়কালে পূর্বভারতে অনেক বৌদ্ধ সংঘ ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল 'নালন্দা'। এসকল সংঘে জ্ঞান-বিদ্যা চর্চার

যেমন চূড়ান্ত পরিনতি ঘটে একই সাথে চারুকলা ও কারুশিল্পেরও প্রকাশ সমানতালে হয় । আমরা 'মার্গীয়' রীতির কথাই যদি ধরি তাহলে তো বলাই বাহুল্য তাঁর শৈল্পীক গুণাগুণ বিচার করা অনেকটা দূরহ এবং কষ্টসাধ্য । একই ভাবে 'জৈন' ও বৈষ্ণব' পুঁথিচিত্রের ভূমিকাকেও উল্লেখ করতে হয় । স্থানীয় এই সকল পুঁথিচিত্রণ কেবেলই যে প্রাচীন ভারতবর্ষকেই আলোকিত করেছে তেমনটি নয় বরং এর ব্যাপ্তী চীন, কোরিয়া হয়ে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত । এই সময়কালে পুথিঁ চিত্রের প্রতিটি ছবির দুই পাশে দুটি অনিন্দ সুন্দর ভাস্কর্যগুণমন্ডিত লিপির স্তবক, মধ্যস্থলে থাকত যেন দুই পাশে দুই প্রশস্ত অপূর্ব অলংকৃত ফ্রেমে বাধাই করা পুঁথির ছবির সারি *মুরাক্কার* কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।

মোগল সাম্রাজ্যিক *'মুরাক্কা'* চিত্রণের শৈলী :

মুসলিম চিত্রকলার প্রারম্ভ হতে এর চিত্রণ শৈলীতে মুসলমান শিল্পী এবং তাদের তত্ত্বাবধানে অন্য শিল্পীদের অনেক অভিনবত্ব রয়েছে । যে সকল উৎস হতে চিত্রণ শৈলী তারা গ্রহণ করেছেন তার সাথে রয়েছে নিজস্ব উদ্ভাবনী ও নিরীক্ষা । অংকনরীতি, কাগজ, ক্যানভাস, রঙ, তুলি সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণটি সহজ অথবা দুস্প্রাপ্য তা বিবেচনার চাইতে শাসকদের রুচি ও ফরমায়েশ প্রাধান্য পেত ।

ছবি আঁকতে প্রথমে প্রস্তুত হতো মধ্যস্থলের প্যানেল যেখানে শিল্পী মূল ছবিটি আঁকতেন । ছবির পাড় তৈরী করতো অন্য একজন । মধ্যস্থলের প্যানেলে আসল ছবিটি বা 'তসবির'টি একপাশ করে দেওয়া হত । 'তসবিরে'র চারপাশে রাখা হত 'হাশিয়া' । যেখানে 'হাশিয়া' এসে তসবিরের সঙ্গে মিলেছে সেখানে সরু নক্সা করা একটি পটি হত আর তার সাথে হত দুটি রঙিন রেখা । পটিকে বলে 'ফুলকারি' বা 'বালে' আর রঙিন রেখাদ্বয়কে বলা হয় 'যাদবাল' বা 'খাত' । 'ফুলকারি' বললে বুঝতে হবে ফুল দিয়ে অলংকৃত আর 'বালে' বললে বুঝতে হবে একটি নক্সা একটানা ঘুরে ঘুরে গেছে । হাশিয়ার সমস্ত প্রস্থটি সাধারনত ফুটকি ফুটকি সোনা দিয়ে ভর্তি করা হতো । সোনার এই ছিটা নিয়মমত একের পর এক পড়লে তাকে বলতো 'টিক্কি' । আর ছোট ছোট সোনার ফুটকিকে বলতো 'শাফাক' আর মিহি ছিট ছিট সোনাকে বলতো 'গুবারা' ।

মধ্যযুগে মোগল ভারতে ছবি আঁকতে কয়েক ধরণের কাগজের প্রচলন ছিল । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-

১.'হারিরি' বা সিল্কের মত কাগজ; ২.'দৌলতাবাদী' কাগজ যা হায়দ্রাবাদে পাওয়া যেত; ৩.'হিন্দী' নামের সাধারণ কাগজ; ৪.'শিয়ালকোটি' কাগজ যা পাওয়া যেত পান্জাবে; ৫.'মুঘলী' নামক কাগজ পাওয়া যেত দক্ষিণ ভারতে; ৬.'কারদে' নামের কাগজ মহীশুরে পাওয়া যেত; ৭.'বাভসাহা' কাগজ তৈরী হতো বাঁশ থেকে; ৮.'টাটাহা' কাগজ পাট বা টাট থেকে তৈরী হত; ৯.'তুলোট' কাগজ তুলা থেকে বানানো হত; ১০.'শুন্নি' কাগজ হতো শণ থেকে এবং ১১.'ঈরানী' ও 'ঈস্পাহানী' বলে দুটি বিদেশী কাগজ বাজারে খুব প্রচলিত ছিল । এগুলো পারসিক রীতিতে তৈরী করা হত । কাগজগুলো শিল্পীরা তাদের পছন্দ মত আঠা দিয়ে একাধিক সংখ্যককে একসাথে করে গোল নুড়ি দিয়ে মসৃণ করা হত । জমি তার করে রেখার সাহায্যে নক্সা করা হত যাকে বলা হয় 'তার-কশ' । কাগজ ছাড়াও ক্যানভাস বা চটে ছবি আঁকার রেয়াজ ছিল ।

চিত্রাংকনে যে সকল রঙের ব্যাবহার হতো তাহলো- গেরু দিয়ে প্রথমে রেখাচিত্র এঁকে ভুসোকালি দিয়ে ভালো করে আঁকা হতো । ভুসোকালির উপাদান হলো সরিষা তেলের প্রদীপের উপর কর্পুরের কাজল । রঙ তৈরীতে গাছ-গাছড়া, মাটি ও বিভিন্ন পাথর ব্যবহৃত হতো । গালা থেকে হতো আলতা রঙ, হেনার পাতা থেকে কালচে ব্রাউন, মুলতানি মাটি হতে হলুদ, কাশগর থেকে আনা মাটিতে সাদা, হরমচি বা গেরু থেকে লাল, সিঁদুর মাটি থেকে সিঁদুরে, বাদাখশান থেকে আনা ল্যাপিজ ল্যাজুলাই পাথর বা লজওয়ার্দ বা নীল থেকে আসমানী, হলুদ রঙ তৈরীতে হরতেল বা মুলতানি মাটি বা পিউরি অথবা ঢাক ফুলের রস, জাঙ্গাল বা জাঙ্গার গুড়ো থেকে সবুজ রঙ অথবা নীল আর হরতেল মিশিয়ে, জলপাই সবুজ বা মুগ সবুজ বা তরমুজি সবুজ হতো ভুসো এবং হরতেল আর নীল মিশিয়ে, বগেুনি বা পার্পল হতো সিঁদুর আর নীল সহযোগে, গাঢ় পার্পল হতো ভুসো আর হরমুজি মাটি (পারস্য সাগরের হরমুজ দ্বীপ থেকে আনা) মিশিয়ে এবং সোনার তবক ব্যবহৃত হতো প্রচুর পরিমান । পারসিকরা তিসির তেলের সাথে সন্দরক মিশিয়ে একরকম স্বচ্ছ বার্নিশ তৈরী করতেন । সোনার চুমকির কাজ হতো কড়া তুলি দিয়ে ভিজিয়ে সোনা রঙ ছিটিয়ে বা ছোট্ট কাপড়ে মিহিকরা সোনার গুড়া ভরে ছবির উপর থুপ থুপে করে লাগানোর মাধ্যমে । সোনার কাজকে বলতো 'শাফাক' ও 'গুবারা'। অনেক সময় ছবিতে মণি-মুক্তা চূর্ণ করে দেওয়া হতো । একে বলা হতো জারা করা । রঙের স্থায়িত্ব আনতে ভাতের পাতলা মাড়, লবন মিশ্রিত পানি, 'আবিনা' নামক এক ধরণের বিশেষ পানি ও ক্ষেত্র বিশেষে গোমূত্র ব্যবহৃত হতো । কাশ্মীরে পানির পাত্রে পানি রেখে শুকানোর পর যে সাদা লবন পড়ে থাকত তাও ব্যবহার করা হতো । প্রায় সব ছবিই জল রঙ হতো তবে পানির সাথে গঁদ, কষ, আটা, গুড় ও তিসির পানি মিশিয়ে ভিন্নতাও আনা হতো । ছাগল, উট, কাঠবিড়ালি ও নেউলের লোম এবং সিংহলে টেলিটানা বলে এক ধরণের ঘাস দিয়ে তুলি তৈরী হোত ।

মোগল চিত্রকলার *'মুরাক্কা'* তৈরীতে যে সকল শিল্পীরা কাজ করেছেন-

১. বাদশাহ বাবুরের সময়কালে সম্ভবত কোন চিত্রকর্মের কাজ হয়নি ।

২. বাদশাহ হুমায়ূন পারস্য শিল্পীদ্বয় মীর সায়িদ আলী ও খাজা আবদুস সামাদের মাধ্যমে মোগল চিত্রকলার সূত্রপাত ঘটান । এই সময় বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসের পর অনেক হিন্দু ও দক্ষিণী শিল্পী দাস্তানে আমীর হামজাতে কাজ করেন । চিত্রে স্থাপত্য ও গাছপালার রঙে যে প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় তা দক্ষিণী শিল্পীদের কাজ ।

৩. বাদশাহ আকবর পিতার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজ শুরু করেন । আকবরের চিত্রশালায় মীর সায়িদ আলী ও খাজা আবদুস সামাদ এর সাথে আরো যে সকল শিল্পী-কলাকুশলী অংশ নেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলেন- দশ্যন্ত, বাসাওন, মিসকিনা, গোবর্ধন, ভবানীদাস, চেতরমন, কেশু খুর্দ, সুদর্শন, রঞ্জা, নয়নসুখ, কমল কাশ্মীরী, বড় কেসু, ছোট কেশু, ধরমদাশ, জামসিদ, সাহিবদিন, রুকনুদ্দীন, খসরু কুলী ও মধুকালান প্রমুখ ।

৪. বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল চিত্রশালার স্বর্ণযুগে যে সকল শিল্পীরা তাদের কর্মের মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছেন তাদের মধ্যে- আকা রিজা, আবুল হাসান, মনসুর, বিচিত্র, গোবর্ধন, হুনহার, ফারুক বেগ, ফারুক চেলা, চেতরমন, বালাচান্দ, জগন্নাথ, ওস্তাদ মোদী, হাশিম, মহম্মদ আলী, অনন্ত, ফারুক খুর্দ, নাদির উল জামান ও ইখলাসের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় ।

৫. বাদশাহ শাহজাহানের সময়ে মুহাম্মদ জামান (পল জামান), নাদির উল জামান, হুনহার, বিচিত্র, বালচান্দ, মীর হাশেম, মাসুদ, হাশিম, জগন্নাথ প্রভৃতি শিল্পী যার অধিকাংশই পূর্ববর্তী শাসকের সময় হতে কর্মরত ছিলেন ।

৬. বাদশাহ আওরাঙ্গজেব চিত্রকলার প্রতি বিরুপ মনোভাবাপন্ন থাকলেও তাঁর সময় ক্ষেমানন্দ, অনুপ চত্তর, রঘুনন্দন, রায় চিতরমন, জ্ঞানচাঁদ, ইলিয়াস বাহাদুর, ওস্তাদ গোলাব রায়, লছমন সিং, আফজল আলি খান ও রায় ফৎ চাঁদ এর মত শিল্পীগণ মোগল দরবারে নিয়োজিত ছিলেন ।

৭. পরবর্তী মোগল শাসকদের সময় অর্থ্যাৎ আওরাঙ্গজেবের শাসনামলের পর হতে শেষ মোগল শাসক পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে যারা শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন তারা হোলেন- নিধা মাল, নিভাসি লাল, মোহন সিং, শীতল দাশ, গোবিন্দ সিং, গোলাম রেজা, মিহির চাঁদ, খাইরুল্লাহ, মোহাম্মাদ ফকিরুল্লাহ, গোলাম মর্তুজা, মাজহার আলী খান, গোলাম আলী খান, মির্জা শাহরুখ, বাবর আলী খান, আগা মির্জা, নাথা শাহ পান্জাবী, করিম আব্দুল রেহমান, বেলদেভ, অবনিন্দ্রনাথ, লালা ঈশ্বরী প্রাসাদ ও দীপচাঁদ প্রমুখ ।[১৬]

৮. মোগল দরবারে অনেক মহিলা চিত্রশিল্পীর শিল্পকর্ম পাওয়া যায় । তাঁদের মধ্যে- নাদিরা বানু, রোকেয়া বানু, সাহিফা বানু ও নিনি প্রমুখের নাম পাওয়া যায় । উল্লেখিত শিল্পীগণ *'মুরাক্কা'* চিত্রণের সাথে সাথে অন্যান্য মিনিয়চার বা অনুচিত্র তৈরীর কাজও একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন ।

উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মোগল আমলে গ্রন্থ ও *'মুরাক্কা'*য় যে মিনিয়েচার অংকন করা হত তার এক বিশেষ শৈলী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । বস্তুত এই শৈলীর উৎস মধ্যযুগের পশ্চিম এশিয়া বিশেষত পারস্য এবং মধ্য এশিয়া । মোগলদের মুরাক্কার এই রীতি কৌশল তারা অনুকরণ করে শিখলেও পরে তাদের মাধ্যমে এটি নতুনত্বের সাথে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে । *'মুরাক্কা'* কোন কাহিনী নির্ভর চিত্রায়ন নয় । তবে কোন কোন সময় পারস্যের মহাকাব্য, কাব্য সংকলন, শাসকদের বিরত্ব গাথা, শিকার অথবা ধর্মীয় বিষয়কে উপলক্ষ্য করে খন্ডিত আকারে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণণা করে ছবির অনুলিপি তৈরী হত । বিষয়বস্তু যথারীতি পৃষ্টপোষক এর পছন্দ অনুসারে অমাত্যবর্গ, সমাজের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্য, প্রাণি, ফুল, সাধু-সন্তোষ, বিভিন্ন নক্সা এবং নানা প্রকরণের হস্তলিখন এর চিত্রায়ন ।

মোগল চিত্রকলার সকল চিত্রই যে শৈলীতে অংকিত তা থেকে *'মুরাক্কা'* কে অধিক গুরুত্ব ও মমত্ববোধ দিয়ে চিত্রিত করা হোত । বিশেষ তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে তোলা এই মাধ্যমটি মোগল ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ ।

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *মুঘল ভারতের ইতিহাস,* ঢাকা, ইতিবৃত্ত প্রকাশন, পৃ. ৯-৪০

২. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ : মোগল পর্ব,* ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পৃ. ২১১

৩. অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা (প্রথম খন্ড),* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৪২

৪. Yuthica Sharma, *Art In Between Empires : Visual Culture & Artistic Knowledge in Late Mughal Delhi 1748-1857,* Colombia, Colombia University, 2013, p.4

৫. *Ibid,* p. 93

৬. *Ibid,* p. 94-95

৭. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪৩

৮. Yuthica Sharma, *Ibid,* p. 142

৯. *Ibid*, p. 160

১০. Russell, Ralph and Khurshidul Islam, *Galib, Life and Letters*, Delhi, Oxford University Press, 1994, p. 72-75

১১. T.H. Hendley, *Ulwar and its Art Treasures*, London, British Library, 1888, p. 154

১২. Joachihg Bautze, *Inter of Culture : Indian and Western Painting 1780-1910,* Verginia, 1998 p. 60

১৩. রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরুপ : মুঘল চিত্রকলা,* কলিকাতা, থীমা প্রকাশনি, পৃ. ২

১৪. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

১৬. চিত্র তৈরীর নানা শৈলী নিয়ে অশোক মিত্র, রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়, মাহমুদুল হাসান এবং এ বি এম হোসেন তাঁদের গ্রন্থে প্রয়োজন অনুসারে উল্লেখিত তথ্যগুলো সন্নিবেশ করেছেন। মুসলমান শিল্পীগণ উপকরণ ব্যবহারে হারাম অর্থাৎ ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে সকল বস্তু নিষেধ তা পারত পক্ষে গ্রহণ করতেন না। যেমন চিত্রে রঙের স্থায়ীত্ব দেয়ার জন্য গো-মূত্র ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল। অধিকন্তু মুসলমান শিল্পীগণ প্রাকৃতিক এবং ভেষজ উপকরণ ব্যবহার করাতে বেশী আগ্রহী ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

মোগল *'মুরাক্কা'* বা চিত্রিত এ্যালবাম প্রকাশের রীতিকৌশল পারসিক ধারার উত্তরসুরী। *'মুরাক্কা'* শব্দটি পারস্য ভাষাতে অধিক ব্যবহৃত। যেখানে বিশেষত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি সংরক্ষন করা হোত। পাশাপাশি অলংকার সমৃদ্ধ ও মুদ্রিত পাঠ্যবস্তুর মূল অংশ যেখানে প্রতিকৃতির সাথে বিভিন্ন তথ্য ও কবিতা শোভিত। এগুলো রাজ্যের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের প্রতীক যা কুটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও উপহার হিসেবে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এর প্রতিটি পাতা তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়া। প্রথমত খাত (Khatt) যাকে বলা হয় সুন্দর হস্তলিখন (Calligraphy, fine writing), দ্বিতীয়ত তাস্‌বির (Taswir) যা হোল চিত্রাংকন, অংকন। এর উপকরণ সোনা অথবা রঙ (illustration, drawing or painting, illuminated with gold and/ or colour), তৃতীয়ত হাশিয়া (hashiya) বা বর্ডার (borders/margin) নক্সা। এর অন্য একটি বিশেষত্ব হল- কালি ও রঙের মিশ্রণ ও তৈরী কৌশল এবং একই সাথে ওয়াসলি (wasli) বা হাতে তৈরী কাগজ এর উপর তৈরী করা প্রলেপ। এমতাবস্থায় চিত্রকর্মটিকে বর্ডারের মাধ্যমে ফ্রেমবন্দি করা হত এবং প্রতিটি পাতায় একটি চিত্র অথবা দুইটি চিত্রের সমন্বয়ে এ্যালবামের মলাট প্রস্তুতকরা হত এবং বাঁধাই করা হত। *'মুরাক্কা'* বা এ্যালবামগুলো দুইটি মুখোমুখি পাতা বিশিষ্ট চিত্রকর্ম যা পরবর্তী পাতাতে হস্তলিখন দ্বারা শোভিত। প্রধান চরিত্রটি পাতা অথবা বর্ডারের মধ্যবর্তী স্থানে অথবা রেখার কাছাকাছি যাতে বাহিরের দাগটি ভেতরের দাগটিকে ঘেরাও দিয়ে রাখে। চিত্রের উপর ও নীচের দাগগুলো মানানসই ভাবে দেয়া হোত।

মোগল বাদশাহগণ তাঁদের শাসনকালের ইতিহাস, রাজত্ব, সম্পদ, ক্ষমতা এবং আভিজাত্যের মহিমা *'মুরাক্কা'* র মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। অনেক মোগল শাসক তাঁর পরিবার, বন্ধু, ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এই এ্যালবাম তৈরী করতেন এবং অতিরিক্ত হিসেবে হস্তলিখনের অনুচিত্র ব্যবহার করে পাঠকের মনে আলোস্ফুরণ ঘটান। ফলে শাসকদের নির্দেশিত পথে চিত্রকরদের উদ্ভাবনীগুলো এখানে শৈলীনিষ্ঠ করে রাখা হোত।

মধ্যযুগ মুসলমানদের স্বর্ণযুগ। এই সময় *'মুরাক্কা'* চিত্রণের একটি পরম্পরা পারস্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর সূত্র ধরে মোগলরা তাদের রাজকীয় চিত্রশালাতে *'মুরাক্কা'* চিত্রণ শুরু করে। ভারতবর্ষের যে পুঁথি চিত্রণ তা কোন ঘটনা নির্ভর আর *'মুরাক্কা'* হোল পৃষ্টপোষকের অভিরুচি অনুযায়ী প্রতিকৃতি, জীব-জন্তু, ফুল, নকসা ও নমুনা হস্তলিখন দ্বারা তৈরী এ্যালবাম। পুঁথির যে শৈলী বা করণ কৌশল সেই করণ কৌশল শিল্পীরা *'মুরাক্কা'*তেও অনুসরণ করে। এছাড়া হস্তলিপিবিষারদদের যে টেকনিক সেটিও

যৌথভাবে ব্যবহার করা হত। যদিও হস্তলিখন শিল্পের শৈলীর উপর পারস্যে গ্রন্থ ছিল কিন্তু পুঁথির যে চিত্রণ তার শৈলীর উপর কোন গ্রন্থ ছিলনা। এর কারণ হোল- যেহেতু মুসলমানদের জন্য ছবি আঁকা বা প্রাণীর অবয়ব আঁকা ধর্মীয় মতে গর্হিত কাজ। হয়তবা পাপবোধের এই দার্শনিকতা হতে প্রতিকৃতি অংকন শৈলীর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।

ভারতবর্ষের মোগল ইতিহাসে *'মুরাক্কা'* চিত্রণের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে-সাথে আন্ত-দেশীয় সম্পর্ক রক্ষার যে কুটনৈতিক তৎপরতা তার একটি শক্তিশালি মাধ্যম ছিল '*মুরাক্কা'*। শাসকদের দায়িত্ব দিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রেরণের পূর্বে তাদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে রাখা হত। অনেক ক্ষেত্রে তারা বিদ্রোহ করলে অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করলে *'মুরাক্কা'*র প্রতিকৃতি দেখে তাদেরকে সনাক্ত করা হোত। প্রতিকৃতি অংকনের সঙ্গে যুক্ত করা হোত তাঁর জন্ম তারিখ, ক্ষমতারোহনের সময়কাল, মৃত্যু তারিখ, বিশেষ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণণা। *'মুরাক্কা'*তে বংশলতিকা প্রকাশ করে শাসকদের ক্রম ও তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ন তথ্য সন্নিবেশিত থাকত। এই প্রতিকৃতির সম্ভার এখন ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্য।

'মুরাক্কা' বা এ্যলবাম তৈরী করে উপহার হিসেবে প্রেরণ করার রেওয়াজ ছিল। অপরাপর উপঢৌকন থেকে এই উপহারটি বেশী সমাদৃত ছিল। অমাত্যবর্গের প্রতিকৃতি তৈরী করে তাদেরকে অমরত্ব দেয়া হোত। আকবর প্রতিকৃতি অংকনকে চরিত্রাংকন এবং আনন্দ উপভোগের উৎস মনে করতেন। সাধু এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে তাঁদেরকে স্মরণীয় করে রাখা হোত। *দাস্তানে আমীর হামজা* হতে শুরু করে ইসলামের অপরাপর ধর্মীয় বিষয়বস্তু, নবী-রাসুলদের জীবনালেখ্য, পারস্য সাহিত্য, কাব্য, কবিতা, হিন্দু বিষয়বস্তু বিশেষত 'রামায়ন', 'মহাভারত' এবং পৌরাণিক কাহীনি নির্ভর অনেক বিষয়ে মোগল বাদশাহরা *'মুরাক্কা'*তে প্রকাশ করতেন। অন্দরমহলের সম্রাজ্ঞী অথবা অন্য কোন রাজকীয় মহিলা বা অন্তপুরের অন্য কোন মহিলার প্রতিকৃতি অংকনে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাঁদের প্রতিকৃতির যথেষ্ঠ অভাব লক্ষ্যনীয়। এর পরও যে সকল প্রতিকৃতি জন সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। তথাপি কাল্পনিক অথবা বাস্তবিক যাই হোক মোগল মহিলা শিল্পীরা নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে কিছু প্রতিকৃতি অংকন করেছেন।

মধ্যযুগে মোগল শিল্পীরা তাদের পারদর্শিতাকে আধ্যাত্বিক চিন্তার সাথে মিলিয়ে এই কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকতেন। বাদশাহ আকবর তো এই বিষয়ে আলেম উলেমাদের মতামতকে উপেক্ষা করে প্রতিকৃতি অংকন পূণ্যের কাজ পরন্তু স্রষ্টাকে স্মরণ করার মাধ্যম বলে মনে করতেন। হয়তো এই মতামত সকল মোগল শাসকের ছিল না। তবুও চিত্রকলার প্রতি তাঁদের যে মমত্ববোধ ও ভালবাসা

তা ইতিহাসে তাঁদের অন্য কৃতিত্বের চাইতে এটিকে বেশী ভাস্বর করে রেখেছে । দুভ্যাগ্যবশত চিত্রকলার এই অভিনব কৌশলের অধিকাংশ *'মুরাক্কা'* পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । যদিও সকল ক্ষেত্রেই তথ্যের যথেষ্ট স্বল্পতা রয়েছে ।

মোগলদের পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকগণ স্হাপত্যবিদ্যা, ইতিহাস ও সাহিত্যে যতটা পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন চিত্রকলাতে ততটাই অনগ্রসরতার প্রতিফলন ঘটেছে । মুসলিম শাসনের এই ক্ষণে মোগলরা যখন এলেন তখনই তাদের হাতের স্পর্শে জীর্ণ-শীর্ণ অপরিপক্ক সকল কিছু নতুন প্রাণ ফিরে পেল । বিষেশত শিল্পকলা প্রখর রদ্দুরের বন্ধ্যাত্য কাটিয়ে ভরা বর্ষার অথৈ পানিতে পাল তুলে নিশ্চিন্তের পথে হাটতে শুরু করল । ভারতবর্ষের এই সময়কার মুসলমানদের একটি বড় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় মোড়কে স্বৈরতান্ত্রীক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনমত ধর্মনিরপেক্ষতা ফলাও করে প্রচার । হয়তবা সে কারণে আলেম-উলেমাদের মতামতকে উপেক্ষা করেই জাগতিক ভোগ-বিলাসে অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় । যাই হোক, সূদীর্ঘ ৩৩১ বৎসরের শাসনকালে তাদের রেখে যাওয়া কীর্তিগুলোই ভারতবর্ষের আজকের গর্বের ভান্ডার ।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের প্রতিকৃতি আঁকতে গেলে কেবল তার অবয়বকেই আঁকা যায় না বরং শরীর ছেড়ে তার মনকেও খানিক তুলে ধরতে হয়। অনুরুপভাবে কোন চিত্রের বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গেলে দেখতে পাই কোন একটি চিত্রকে আর্ট (art) হিসেবে বলতে হলে দেখতে হবে যে- তার দ্বারা একটি সমগ্র স্ফুট চৈত্রিক অবস্থা উৎপন্ন হলো কিনা। তা যদি হয় তবে অবয়বগত, স্থানিক, পারিপার্শ্বিক, রঙ কিংবা রেখার কি ধরণের কার্যাদি সম্পন্ন করেছে তা বলাই বাহুল্য। মনোবিজ্ঞানের শাস্ত্রে মানুষের মধ্যে নিরন্তর নানা ভাবতরঙ্গ খেলে বেড়ায় তার ইঙ্গীত রয়েছে। সাধারণত শিল্পীরা তারই কোন একটি অবস্থা বিশেষকে অঙ্কিত করার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক চিত্রসূত্রে লিখিত আছে- 'সুপ্তং চেতনাযুক্তং চৈতন্যবজ্জিতম, নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ'- অর্থাৎ যে চিত্রী নিদ্রিতকে নিদ্রিতের ন্যায় আঁকিতে পারে, চেতনাবানকে সচেতনের ন্যায়, মৃতকে মৃতের ন্যায়, চৈতন্যহীনকে চৈতন্যহীনের ন্যায়, উচ্চ স্থানকে উচ্চ স্থানের ন্যায় চিত্রে ফুটাইতে পারে তাকে 'চিত্রজ্ঞ' বলা যেতে পারে। ভারতীয় চিত্র শিল্পের ইতিহাসে মোগল শিল্পীরা এই কৃতিত্বের যথাযথ দাবীদার । মোগল চিত্রকলার ইতিহাসে যে সকল বাদশাহ, অমাত্যবর্গ, পৃষ্টপোষক ও শিল্পী-কলাকুশলী তাঁদের শিল্প মানুষিকতার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে শতাব্দীর অধিককালের ঐতিহ্যগত ভারতীয় মুসলিম চিত্রকলা যে পৃথীবির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই *'মুরাক্কা'*।

পরিশিষ্ট- ১

(অভিসন্দর্ভ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চিত্রাবলী)

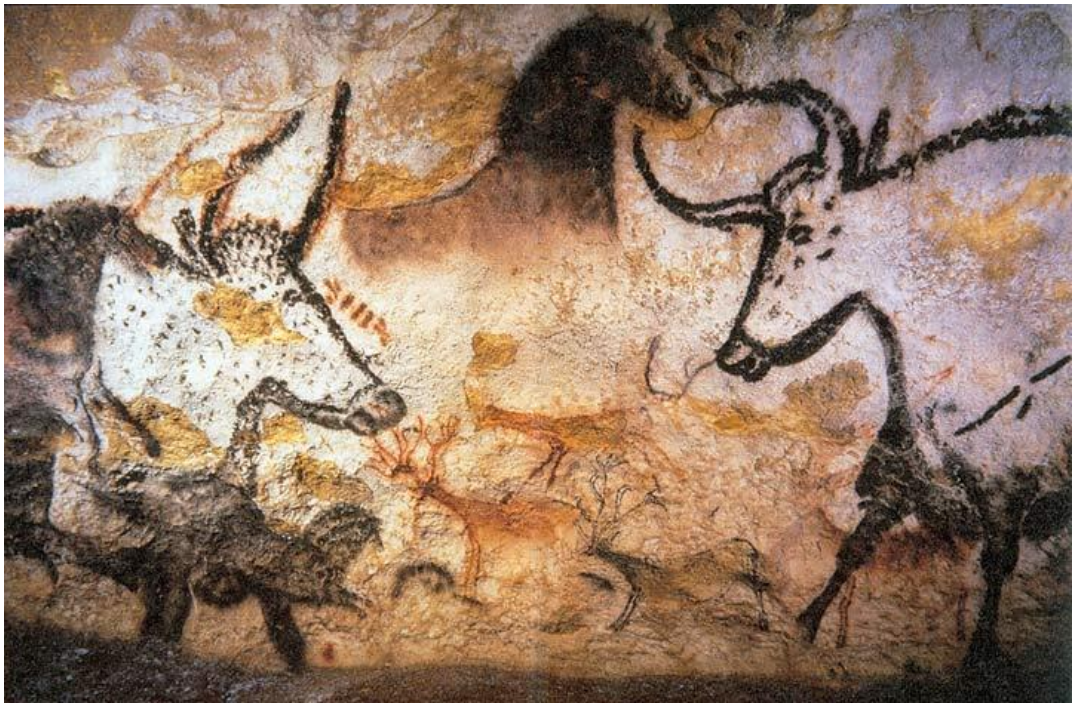

১. ফ্রান্সের Montignac এ অবস্থিত Lascaus গুহাচিত্র

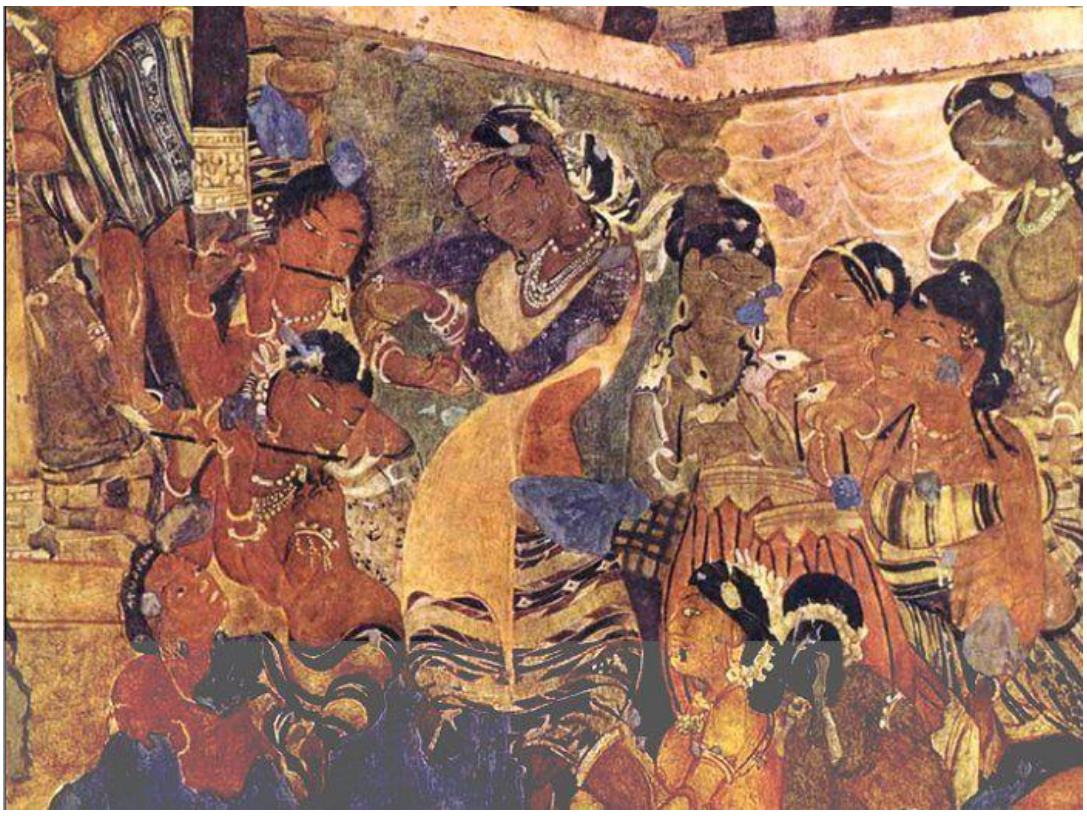

২. ভারতবর্ষের অজান্তা গুহাচিত্র

৩. খলিলের হস্তলিখন, চেষ্টারবেটি, ১৪৬৩ খ্রি:

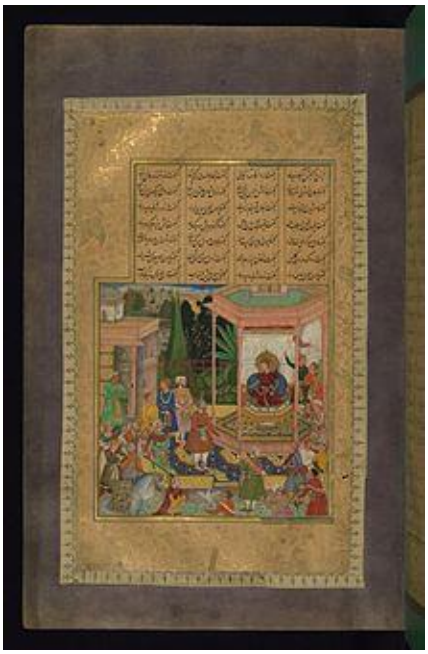

৪. খামসার চিত্র, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ১২৮০ খ্রি:

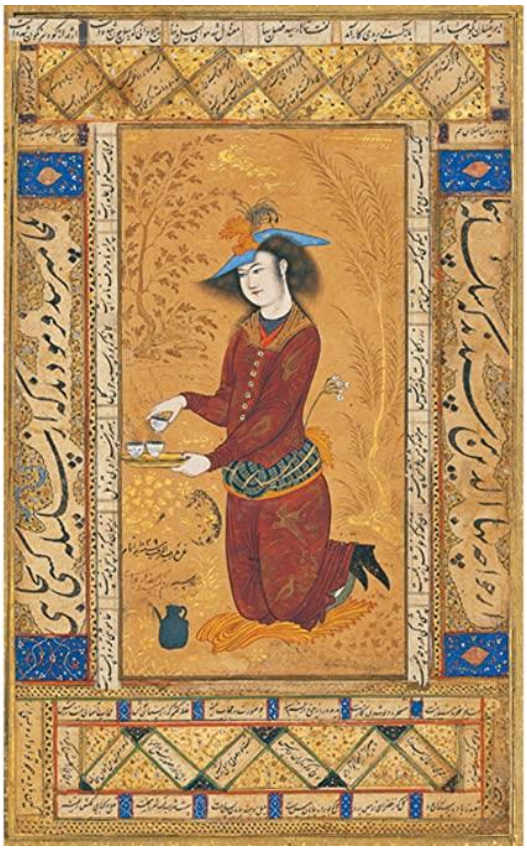

৫. মহিলার প্রতিকৃতি, রেজা আব্বাসি, বিবলিউথিক মিউজিয়াম, ১৫১০ খ্রি:

৬. রজমনামা, ব্রটিশ মিউজিয়াম, ষোড়শ শতকের শেষ

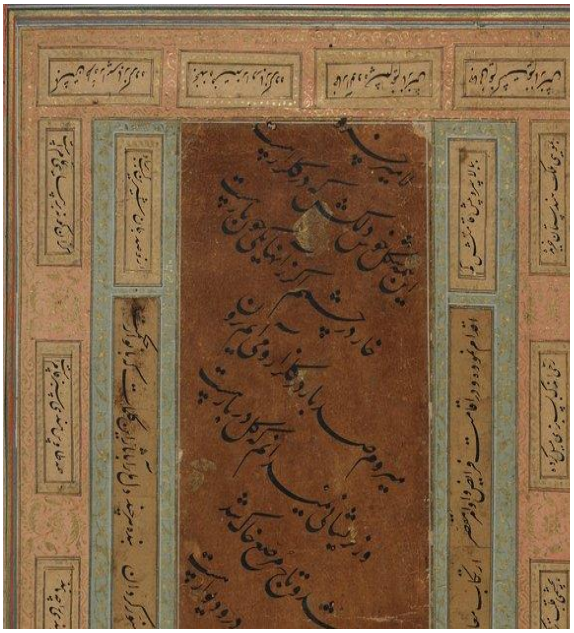

৭. Verse of Amir Khosru, জেনেট সংগ্রহ, ১৬০০ খ্রি:

৮. ফেরদৌসির শাহানামা, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম, ১৩৩০ খ্রি:

৯. ইউসুফ-জুলাইখার উপখ্যান, বিহযাদ, বুখারা চিত্রশালা, ১৫৪০ খ্রি:

১০. বাবুর, ভীভার সংগ্রহ, ১৬০০ খ্রি:

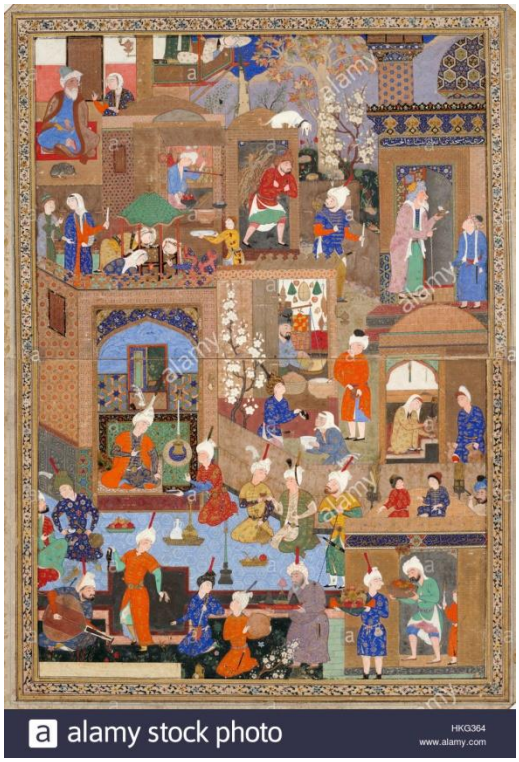

১১. হামজানামা, মীর সায়িদ আলী, চেষ্টারবেটি, ১৫৪০ খ্রি;

১২. আকবর, খাজা আবদুস সামাদ, ফ্রিয়ার গ্যালারি অফ আর্ট, ১৫৮০ খ্রি:

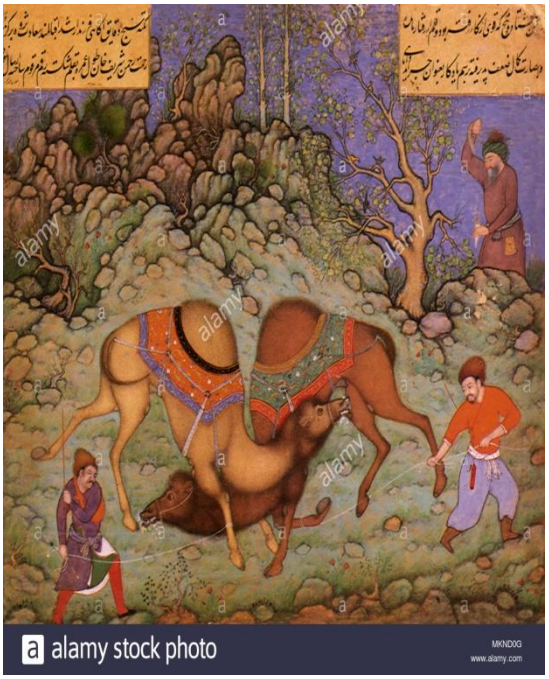

১৩. কলহরত উট, নানহা, প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়াম, মুম্বাই, ১৬২০ খ্রি:

১৪. হাতি, গোলাম আলি, আগা খান সংগ্রহ, ১৬২১ খ্রি:

১৫. মুরাক্কা-ই-গুলশান, বাসওয়ান, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ১৬১০ খ্রি:

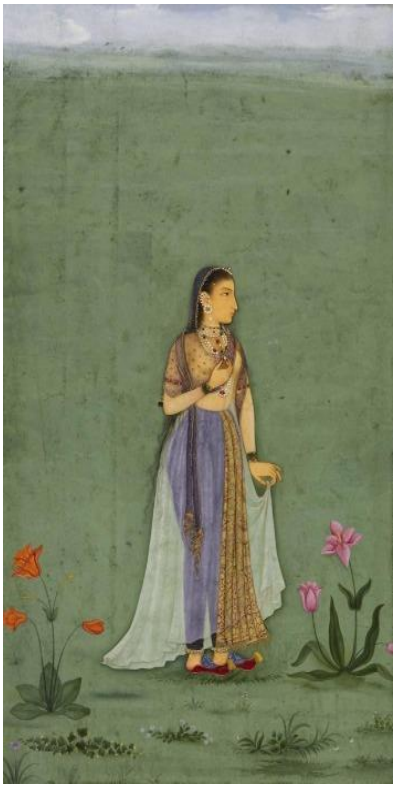

১৬. নাদিরা বানু, গোলেস্তা লাইব্রেরি, তেহরান, ১৬২০ খ্রি:

১৭. সাদি গুলিস্তান সহ, হিরাত চিত্রশালা, চেষ্টারবেটি, ১৪২৪ খ্রি:

১৮. জাহাঙ্গীর দরবেশের সাথে, বিচিত্রণ, ফ্রিয়ার গ্যালারি অব আর্ট, ১৬২০ খ্রি:

১৯. শাহজাহান-মমতাজ, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ১৬৫০ খ্রি:

২০. অশ্বারোহী আওরাঙ্গজেব, ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম, ১৬৯০-১৭১০ খ্রি:

২১. মুরাক্কাই গুলশান, ফররুখ চেলা, Nelso Atkins Museum of Art, ১৫৯৫ খ্রি:

২২. মনোহর ও অন্যরা, পায়াগ, বৃটিশ মিউজিয়াম, ১৬১০ খ্রি:

২৩. ইনায়েত খাঁ, গোবর্ধন, বোষ্টন মিউজিয়াম, ১৬৮০ খ্রি:

২৪. নীল গাই, ওস্তাদ মনসুর, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম, ১৬৭০ খ্রি:

২৫. অবসর জাপন, লেট মোগল, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ১৮৪০ খ্রি:

২৬. পবিত্র আল-কোরআনের পাতা, লেট মোগল, ইন্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরি, ১৮৩০ খ্রি:

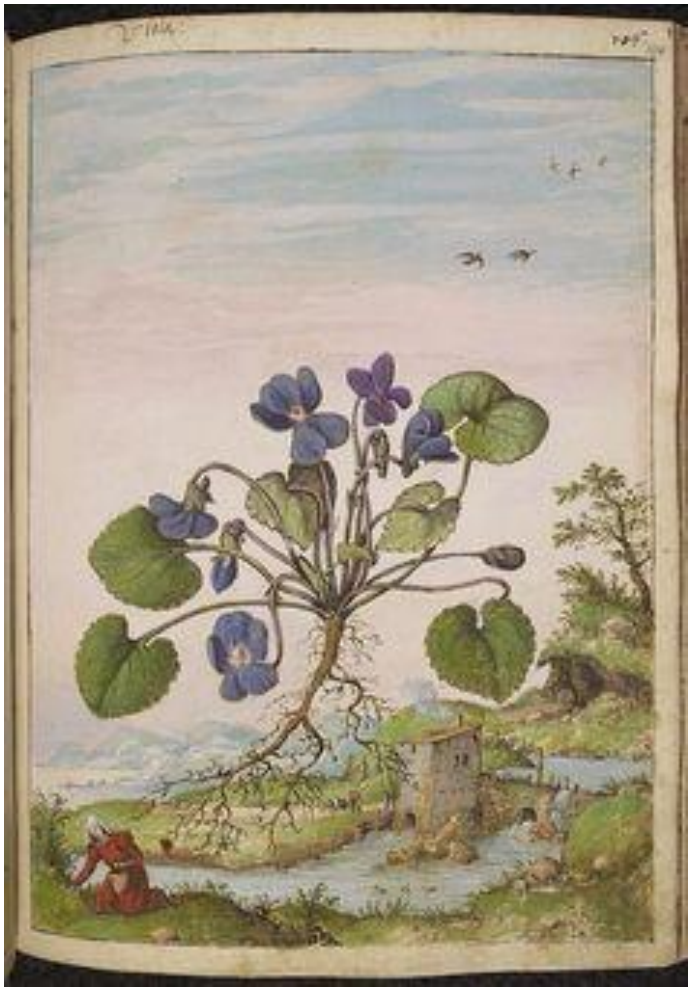

২৭. ফুলের গাছ. লেট মোগল, ইন্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরি, ১৮৩০ খ্রি:

২৮. কোরানের স্বর্ণখচিত পাতা, জয়পুর স্টেট লাইব্রেরি, ১৮৫০ খি:

পরিশিষ্ট- ২
(চিত্রকলার পরিভাষা)

১. **গোয়াশ**- আঠাযুক্ত জলরঙ যা মোগলরা ব্যবহার করত

২. **গালমাচ**- গোফ এবং জুলফি যা বাদশাহ আকবরের প্রতিকৃতিতে ব্যবহৃত হয়েছে

৩. **তার-কশ**- ছবির জমিনটি তার অর্থ্যাৎ মসৃণ করে রেখার সাহায্যে নকশা করা

৪. **জারা**- মণিমুক্তা চূর্ণ

৫. **বাকবাক-** মিনিয়েচারে আরব্য নক্সা, ফুল, লতাপাতা ছাড়া ব্যাবহৃত পৌরাণিক গাছের ডালে ফলের পরিবর্তে মানুষ, জীবজন্ত ও পাখির মাথা ঝুলে থাকা

৬. **বুবিন-** ছুঁচের মতো ধারালো যন্ত্র যা দিয়ে তামার প্লেটের উপর মোমের আস্তরণে ছবি আঁকা হতো

৭. **এনগ্রেভিং-** কাঠ খোদাইকৃত নক্সা যা ছাপ দিয়ে আঁকা হতো

৮. **হাশিয়া-** কোন পৃষ্ঠার অলিখিত প্রান্তিক অংশ যা টিকা লেখার জন্য ব্যবহার করা হত এবং নানা ধরণের নক্সা আঁকা হত । মোগলরা এতে জীব-জন্তু ও মানুষের চিত্র সংযোজিত করতো

৯. **সিটিং-** প্রতিকৃতি অংকনের জন্য ব্যক্তির ভঙ্গীমা; চিত্রের মডেল হওয়া

১০. **মেডালিয়ন-** পদকনক্সা

১১. **আহাদি, ফরাশ, কদুবাচি**- শিকারী পশুদের উপাধি

১২. **খেয়ালি তসবির-** জাহাঙ্গীরের সময়কার প্রতিকৃতিচিত্র যেখানে তাঁকে বিচিত্র ঘটনার প্রধান করে চিত্রণ করা হয়

১৩. **এ্যারাবেস্ক-** আরব্য লতা-পাতা ও ফুলের নক্সা

১৪. **বর্তনা-** যে সব চিত্ররীতিতে শিল্পীরা ভাস্কর্যের বিন্যাস অনুসরণ করতেন

১৫. **ল্যান্ডস্কেপ-** নিসর্গের দৃশ্য চিত্র

১৬. **মাউন্ট-** মূল ছবিটিকে সুন্দরভাবে বসানো

১৭. **অ্যাগেট পাথর-** যে পাথর দ্বারা সাদা কাগজকে ঘষে আরো সাদা করা হত

১৮. **শেডিং**- প্রত্যেকটি রঙের সাথে অন্য ঘন রঙ মিশিয়ে সরু তুলির দাগে এক অংশকে অন্য অংশ হতে আলাদা করা

১৯. **তিওমা**- গ্রন্থের শেষ অংশে যে যায়গা ছেড়ে রাখা হয়

২০. **এক চশমি**- প্রতিকৃতির পার্শ্ব দর্শন রীতি ।

২১. **গোলাব পাশী**- পারস্যে আব-পাশী বা পানি বর্ষণের আধার

২২. **প্রফাইল**- মুখ এক পাশ করে আঁকা প্রতিকৃতি

২৩. **হ্যালো-** প্রতিকৃতির মাথার পেছনে উজ্জ্বল আলোর চক্র যা অন্যদের থেকে ওই ব্যক্তিকে আলাদা করে। সাধারণত রাজা বাদশাহ এ সাধু সন্তদের মাথার পেছনে হ্যালো অংকিত হত যা তাদের পবিত্রতা ও ক্ষমতার প্রতীক, এটি কাল্পনীক

২৪. **থ্রি কোয়ার্টার-** প্রতিকৃতি আঁকার তিন-চতুর্থাংশ রীতি

২৫. **ফোরশটেনিং-** অবয়বের সম্মুখ দিকটা খাটো করে আঁকা

২৬. **কিয়ারোসকিউরো**- ছায়া তপ

২৭. **প্রোটরেইট-** প্রতিকৃতি

২৮. **মিনিয়েচার**- ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র যা পুঁথি চিত্রণ ও মুরাক্কায় (এ্যালবাম) অংকন করা হয়

২৯. **ল্যাপিজ ল্যাজুলাই-** পারস্যের নিলাভ পাথর গুড়া করা এক ধরণের রং

৩০. **পার্সপেকটিভ**- পরিপ্রেক্ষিত

৩১. **শিয়াহি কলাম**- কালো কালির ব্রাশের ড্রইং

৩২. **দি আনানসিয়েশন**- মেরীর গর্ভে যীশু জন্ম নেবেন এক দেবদূত কর্তৃক তার ঘোষণা

৩৩. **নওরোজ-** পারস্যের নববর্ষ যা মোগল বাদশাহগণ ভারতেও উৎযাপন করত

৩৪. **টেম্পেরা**- সাধারণত ডিমের সাদা লালার সাথে রঙ মিশিয়ে যে বর্ণ তৈরী করা হয়

৩৫. **চোলা**- এক ধরণের পোষাক: সাধারণত সাধু-সন্তোগণ এটি পরিধান করত

৩৬. **রিলিফ**- পটভূমির অন্যান্য গৌণ বস্তু থেকে মুখ্য বিষয়টিকে বিশেষ করে ফুটিয়ে তোলা। সাধারণত ভাস্কর্যে রিলিফ পদ্ধতি ব্যাবহার করা হয়ে থাকে

৩৭. **আবিনা-** ছবিতে ব্যবহৃত এক প্রকার জল

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, tr. by H. Blochmann, Delhi, Low Price publications, 2006

Babar, *Babur-Nama,* tr. by Annette S. Beveridge, Delhi, Low Price publications, 2012

Begum, Gulbadan. The History of Humayun. Translated by Annette S. Beveridge. Delhi: India, 1972.

Gulbadan Begam, *Humayun Nama*, tr. Annette S. Beveridge, New Delhi, Good Word Books, 2001

Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangiri,* tr. Alexander Rogers, ed. Henry Beveridge, Delhi, Low Price Publications, 1989

Niccolao Manucci. Memoirs of the Mughal Court (Ed. Michael Edwardes). London: Folio Society, 1963.

Salim, Nur-al-Din M. The Jahangirnama: Memoirs of Jahangir, Emperor of India. Edited, translated and annotated by Wheeler M. Thackston. New York: Oxford University Press, 1999

ইংরেজি গ্রন্থ

Alvi, Sajida S. *Perspectives on Mughal India: Rulers, Historians, 'Ulama' and Sufi**s***. Pakistan: Oxford University Press, 2012.

Anand, Mulk Raj. *Album of Indian Paintings*. New Delhi: National Book Trust India, 1973.

Arnold, T. W. and Guillaume A. (ed.). *The Legacy of Islam* (Frist published, 1931) reprint, London: OUP, 196O.

Archer, W. G. *Indian Painting*. London: B. T. Batsford Ltd., 1956.

…… *Indian Miniatures*. London: Studio Books, 1960.

Arnold, T. W. *Painting in Islam* (first published, Oxford, 1928), New ed. New York: Dover Publications, Inc., 1965.

Barrett, Douglas. *Painting of the Deccan (16th-17th Century).* London: Faber & Faber Ltd., 1958.

Barrett, Douglas and Basil Gray. *Indian Painting* (first published, Geneva: Albert Skira, 1963). New ed., London: Macmillan London Ltd., 1978.

Beach, Milo C. *Mughal and Rajput Painting*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

…….. *The Imperial Image: Paintings for the Mughal Court*. Washington, DC: Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, 2012.

Beach, Milo C.,Eberhard Fischer and B. N. Goswamy. *Masters of Indian Painting: 1100-1650.* Artibus Asiae Pubishers, 2011.

Beach, Milo C., Barrett, D. *Mughal and Rajput Paintings*. The New Cambridge History of India. Vol. 1 & ll Cambridge U. P. 1992.

Bhattacharya, Ashok K. *Technique of Indian Painting.* Calcatta: Saraswati Library,1976.

Binyon, Wilkinson and Gray. *Persian Miniature Painting*. Oxford Publisher, 1933.

Binyon, L. Wilkinson, J. V. S. and B. Gray. *Persian Miniature Painting*. London: OUP, Humphrey Milford, 1933.

Binyon, L. and T. W. Arnold (ed.). *The Court Painters of the Great Mughals*. London: Humphrey Milford: OUP, 1921.

Blochet, E. *Mussalman Painting (12th-15th Century).* Translated by C. M. Binyon. London: Methuen & Co., 1929.

Barret, Douglas and Basil Gray. *Indian Painting*. New York: Rizzoli, 1978.

Brij Bhushan, Jamila. *Indian Jewelry, Ornaments and Decorative Designs*. Bombay: D. B. Taraporevala Sons & Co. Privet Ltd., 1964.

Brown, Percy. *Indian Painting Under the Mughals (1552-1750),* London: Oxford Publisher, 1924

Brend, B. *Islamic Art.* Harvard: University Press, 1991.

Bussagli, Mario. *Indian Miniatures*. Translated by Raymond Rudorff. London: Paul-Hamlyn, 1969.

Bushra, Hamama Tul, *Gulshan Muraqqa : an Imperial Discretion,* Missouri: University of Missouri-Kansas City, 2016

Carlo Calza, Gian. *Akbar: The Emperor of India*. Milan, Italy: Skira, 2012.

Chaitanya, Krishna. *A History of Indian Painting: Manuscript, Moghul and Deccani Traditions.* New Delhi: Abhinav Publications, 1979.

Chakraverty, Anjan. *Indian Miniature Painting.* New Delhi: Lustre Press, 1996.

Chandra, Moti. *Technique of Mughal Painting*. Lucknow: U. P. Historical Society, 1949.

Clarke, C. S. *Twelve Paintings of the School of Humayun.* Victoria & Albert Museum, 1921. (Indian Drawing, *Thirty Mughal Paintings of the School of Jahangir in the Wantage Bequest*. Victory & Albert Museum, 1922).

Clarke, Stanly C. *Thirty Mogul Paintings of the School of Jahangir in the Wantage Bequest*. London: Victoria & Albert Museum, 1922.

Coomaraswamy, A. K. *Indian Drawings*. Vol. l, London: n. p., 1910-12.

……., A. K. *Introduction to Indian Art*. Second Edition. Delhi: Munshiram Manoharlal Oriental Publishers, 1969.

Craven, Roy C. *Indian Art: A Concise History*. London: Thames and

Hudson, (First Published, 1976), Reprint, London: Thames and Hudson, 1991.

Grill, Rosemary, Susan Strong and Andrew Topsfield. *Art of Mughal India: Studies in honour of Robert Skelton.* London: Mapin Publishing, 2004.

Das, Asok K. *Splendour of Mughal Painting.* Bombay: Vakils Feffer & Simsons Ltd., 1986.

……. *Dawn of Mughal Painting.* Bombay: Vakil & Sons Ltd., 1982.

……. (ed.). *Mughal Masters: Farther Studies*. Mumbai, India: Marg Publication, 1998.

…….. *Mughal Painting during Jahangir's Time.* Calcutta: The Asiatic Society, 1978.

Dimand, M. S. *A Handbook of Muhamadan Art.* New York: Hartsdale House, 1947.

E. Schroeder. *Persian Miniature in the Fogg Museum of Art*. London: Cambridge Mass, 1982.

Eraly, Abraham. *The Mughal World, India's Tainted Paradise*. London: Orion Books Ltd. 1997.

Eslami, Kambiz, *'Godsan Album,'in Encyclopaedia Iranica*, ed. Ehsan Yarshater. New York: Encyclopaedia Iranica Foundation, 2003.

Ettinghausen, R. *Arab Painting.* London: Albert Skira, 1962.

E, Wcllesz. *Akber's Relgious Thought as Reflected in Mughal Painting*. London.1952

F. R. Martin. *The Miniature Paintings and Painters of Persia, India and Turkey from the 8th to 18th Century*. 2 vols. London: oxford Publishers, 1912.

Guy, John and Jorrit Britschigi. *Wonders of the Age: Master painters of*

India. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2011.

Habib, Irfan*. An Atlas of the Mughal Empire*. Delhi: OUP, 1982.

Haig, Sir Wolsely (ed.). *Cambridge History of India*. 3 vols. Cambridge: Cambridge University of Press, 1928. Reprint, Delhi: S. Chand & CO., 1958.

Hasrat, B. J. *Dara-Shikoh: Life and Works* (First published, 1979), second revised ed., New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Privet Ltd., 1982.

Joaching Bautze, *Inter of Cultures : Indian and Western Painting 1780-1910,* Verginia, 1998

Kuhnel, Ernst and Hermann Goetz*. Indian Book Painting: From Jahangir's Album in the State Library in Berlin.* London: Strphen Autin and Sons, Ltd., 1926.

Lal, Munni*. Jahangir*. Delhi: Vikas Publishing House Pvt,. 1983.

Leach, Linda Y. *Mughal and other Indian Paintings*. London: Scorpion Cavendish, 1995.

Losty, Jeremiah P. *The Art of the Book in India*. London: The British Library, 1982.

Losty, Jeremiah P., and Malini Roy. *Mughal India: Art, Culture and Empire*. London: British Library, 2012.

Majlis, Najma Khan, *Selected Essays on Art and Architecture,* Dhaka : Itibritto Prokashan, 2019.

M, Mustafa. Persian Miniatures of Bihzad and his school in Cairo Collection, London, 1960.

Okada, Amina. *Imperia Mughal Painters.* Deke Dusinberre, Paris: Flammaarion, 1992.

Pal, Pratapaditya. *Court Paintings of India 16th- 19th Centuries*. New York:

Navin Kumar, 1983.

……., ed. *Masters Artists of the Imperial Mughal Court*. Bombay, India: Marg Publication, 1991.

Papadopulo, Alexander. *Islam and Muslim Art*. Mazenod, Paris: Thames & Hudson Publishers, 1976.

Pope, Arthur Upham. *Masterpieces of Perian Art*. New York: Uryden Press Publishers, 1945.

Pope, Arthur Upham(ed.) and Phyllis Ackerman(asst.ed.). *A Survey of Persian Art*. New York: Uryden Press Publishers, 1945.

Rahman, M. L. *Persian Literature in India during the Time of Jahangir and Shah Jahan*. Baroda Press, 1970.

Rai, Krishnadas*. Mughal Miniatures*. Delhi: Lalitakala Academy, 1955.

Renard, John. *The A to Z of Sufism*. UK: Scarecrow Press Inc., 2005.

Rice, D. T. *Islamic Art.* London: Thomas & Hudson, 1976.

R.M. Savoury*, Introduction to Islamic Civilization*, Cambridge, Cambridge University Press,1976.

Roxburgh, David J. *The Persian Album, 1400-1600*. London: Yale University Press, 2005.

Russell, Ralph and Khurshidul Islam, *Galib, Life and Letters,* Delhi, Oxford University Press, 1994

S. Blair & Bloom, J*. Art and Architecture of Islam (1250-1850).* New York: Pelican Publishers, 1993.

Sarkar, Sir J. *The Fall of the Mughal Empire* (Frist edition, 1912-1913), third edition, Calcutta: M. C. Sarkar, 1964.

Sharma, Yuthika, *Art in between empires : Visual Culture & Artistic Knowledge in late Mughal Delhi 1748-1857*, Columbia: Columbia University, 2013

Semsar, Mohammad-Hasan. *Golestan Palace Library: A Portfolio of Miniature Paintings and Calligraphy*. Karim Emami, ed. and trans., Tehran: Zarrin & Simin Books, 2000.

Sen, Geeti. *Paintings from Akbar Nama*. Delhi. India: Lustre Press Pvt. Ltd., 1984.

Skira, Albert. *Persian Painting*. New York: Rizzoli International Publication, Inc., 1977.

Smith, V. A. *Akbar, the Great Mughal: 1542-1605*. Frist ed., 1919. second revised edition, Delhi: S. Chand and Co., 1962.

Stronge, Susan. *Painting for the Mughal Emperor*. New York: V & A Publications, 2002.

T.H. Hendley, *Ulwar and its Art Treasures,* London, British Library, 1888

Titley, Norah M. *Persian Miniature Painting and its influence on the art of Turkey and India. Austin*, Texas: University of Texas Press, 1984.

Topsfield, Andrew. *Painting from Mughal India.* Oxford: Bodleian Library Oxford, 2008.

Verma, Som P. *Interpreting Mughal Painting: Essays on Art, Society, and Culture*. New Delhi, India: Oxford University Press, 2009.

…….. *Painting the Mughal Experience*. New Delhi, India: Oxford University Press, 2005.

Welch, Anthony and Stuart Cary Welch. *Arts of the Islamic Book*. London: Cornell University Press, 1982.

Welch, Stuart C. *The Emperors' Album: Images of Mughal India*. New York: Metropolitan Museum of Art, 1987.

Welch, Stuart C. and Milo C. Beach. *Gods, Thrones, and Peacocks*. New York: An Asia House Gallery Publication, 1965.

Yuthika Sharma, *Art Between Empires : Visual Culture & Artistic*

Knowledge in Late Mughal Delhi 1748-1857, Colombia University, 2013

অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ

Khan Majlis, Najma. ***Portrayal of Women in Mughal Painting***. IBS. Rajshahi University, Ph. D Thesis, 1990.

Relia, Anil, ***The Indian Portrait-IV (Muraqqa- an Anthological Journey of the Mughal Empire)***, Exhibition 14-19 October, Ahmedabad : Amdavad ni Gufa, 2014

এনসাইক্লোপিডিয়া

Encyclopaedia of World Art. Vol. II

Encyclopaedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, New York : Encyclopaedia Iranica Foundation 2003

Banglapedia, National Encyclopedia of Bangladesh , Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2015

ইংরেজি সাময়িকী

A.C, Ardeshir. 'The Ardeshir Collection of Mughal Miniatures'. Roopa Lskha N. S. I (2), Accession number 48-12 1 and 2, South Asian Department, Nelson Atkins Museum of Art, Accessed 03/2013, 1940

Arnold, T. W*. Arabic and Persian Manuscripts in Journal of Indian Art*. Vol. 15. No. 120. London, 1914.

Arnold, T. W. '*The Johnson Collection, India Office'*. *Rupam*. No.6, 1921.

Notes on Oriental Manuscripts (Chester Beatty Collection). *Indian Art and Letters*. Vol. iii. Pt.1. 1929.

'An Early Mughal Illustrated Page'. *British Museum Quarterly* No. 8, 1934. A New Mughal Painting of Stuff*. ATS Islamica*. Vol. 4, 1937.

'Treasures of Indian Miniatures'. Oxford, 1955.

Asma, Sirajuddin. '*Emperor Akbar and his School of Paintings'*. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* Dhaka: Vol. xxviii, No- 2, Dec. 1982.

Basu, R. '*The Ajit Ghose Collection of Old Indian Paintings'*. *The Modern Review*. Calcutta: January, 1926.

Brown, Percy. *An Early Mughal Painting.* Metropolitan Museum Studies, Vol. ll. Pt. 2, 1930.

Canby, Shiela, ed. Humayun's Garden Party: Princes of the House of Timur and Early Mughal Painting. Bombay, India: Marg Publications, 1994.

Codrington, K. & De. B. '*Portraits of Akbar, the Great Mughal' (1542-1605*) *in Burlington Magazine*. Vol. 82. London, 1943.

Cohn- Wiener, E. '*Miniatures of a Razm Namah from Akber's Time', Indian Art & Letters.* Vol. 1. No. 2. London, 1938.

Das, Asok Kumar. '*Ustad Mansur'*. *Lalitakala*- 17, Lalitakala Academy, India.

E, Wcllesz*. 'An Akber Namah Manuscript*'. *Burlington Magazine.* Vol. 80. London, June, 1942.

Goetz, Hermann. *'The Early Muraqqa's of the Mughal Emperor Jahangir*'. *East and West*_8, no. 2 (July 1957): 157-85.

Ghose, A. '*A Comparative Study of Indian Painting'*. *Indian Historical Quarterly*. Vol. 2. 1926.

Hasan, S. M. *'The Mughal Portrait Style'*. *Dhaka University Studies*. Dhaka University. Vol. 10, June, 1961.

J. V. S, Wilknson*. Indian Paintings in a Persian Museum. Burlington Magazine*, 1935.

Khan Majlis, Najma. ' *Women Painters During The Time of Emperor*

Jahangir (1605-1627 A. D.)'. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* (Hum), Dhaka: vol.- xxxi, No. 2, December 1986.

Khan Majlis, Najma. ' Representation of Professional and Working Women in Mughal Miniature Painting (16th-18th Century)', *Published in the Proceeding of the Indian History Congress,* 2007 (67th Session) Calicut, India.

Khan Majlis, Najma. ' A Comparative Study of the 16th-17th Century Mughal and Deccani Paintings', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol.37, vol.2, December 1992

Losty, Jeremiah P. 'The 'Bute Hafiz' and the Development of Border Decoration in the Manuscript Studio of the Mughals.' *The Burlington Magazine* 127, no. 993 (Dec. 1985): 855-856+858-871. Accessed January 29, 2014. http://www.jsor.org/stable/882258.

M. S. Dimand*. 'Several Illustrations from the Dastan-i-Amir Hamza in Amarican Collections'. Artibus Asiae,* vol. ii, No. 1-2. Ascona. Switzerland, 1948.

Seyller, Jhon. ' Folios from Muraqqa' Gulshan.' Paper Presented at the symposium of the Echoes: Islamic Art Exhibition at the Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri, March 8-9, 2014.

বুলেটিন

Beach, Milo C. 'The Gulshan Album and its European Sources*.'Bulletin of the Museum of Fine Arts* 63, no 332(1965): 63-91.

Chaghatai, M. A. '*The Illustrated Edition of the Razm Namah*,' Bulletin of the Deccan College Research Institute, vol- 5, Poona, 1944.

Hendley, T. H*. Written for the Emperor Akbar*, Bulletin of the School of Oriental Studies, 1934.

ক্যাটালগ সংগ্রহ

Arnold, T. W. and Wilkinson, J. V. S. *'The Library of a Chester Beatty.'* A Catalogue of the Indian, Miniatures. 3 vols. 1936. *The Islamic Book*. London, 1929.

Coomaraswamy, A. K*. Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Arts, Mughal Painting*, Cambridge Mass, 1930.

Goswamy B. N. & Eberhard Fiseher. *Wonders of a Golden Age (An Exhibition Catalogue)*, Zurich: Rietberg Museum, Switzerland, 1987.

Hitti, P. K. *Descriptive Catalogue of the Garrett Collection of Persian, Turkish and Indian Manuscripts, Including some Miniatures.* Princeton University Library, Princeton, 1939.

Hendley, T. H. ' *The Razm Namah Manuscript*, Memorials of the Jeypore Exibition,' vol. A, 1913.

Robinson, B. W. *Persian Paintings in the Indian Office Library: A Descriptive Catalogue.* London: Philip Wilson Publisher, 1976.

R. Skelton. *The Art of India and Nepal*. The Nasli & Alice Heeramaneek Collection. Marg. Xii No. 3. June, 1959.

Relia, Anil, *The Indian Portrait-IV (Muraqqa- an Anthological Journey of the Mughal Empire,* Exhibition 14-19 October, Ahmedabad : Amdavad ni Gufa, 2014

Verma, Som P*. Mughal Painters and their work: A Biographical Survey and Comprehensive Catalogue*. Delhi, India: Oxford University Press, 1994.

বাংলা গ্রন্থ

আলী আহসান, সৈয়দ, *শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য,* ঢাকা : শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৩

আহমেদ, কামাল, *শিল্পকলার ইতিহাস,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

আলম, রফিকুল, *বিশ্ব সভ্যতা ও শিল্পকলা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১

ইনাম- উল হক, মুহাম্মদ, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস,* ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৩

কবীর, মফিজুল্লাহ, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণ যুগ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত,* কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভটে লিমিটেড, ১৯৭৫

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, *দরবারী শিল্পের স্বরুপ : মুঘল চিত্রকলা,* কলিকাতা: থীমা প্রকাশন, ১৯৯৯

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শিল্প চিন্তা,* কলকাতা: দীপায়ন প্রকাশন, ২০১২

ভট্টাচার্য, অশোক, *বাংলার চিত্রকলা,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ১৯৯৪

মিত্র, অশোক, *ভারতের চিত্রকলা,* (২ খন্ড), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬

……., *ছবি কাকে বলে,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪

মুখোপাধ্যায়, অশোক, *চিত্র দর্শন,* কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কো: প্রা: লি:, ১৩৯৪

মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ, *মুসলিম চিত্রকলা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯

……., *মুঘল চিত্রকলা,* ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৪

মুস্তফা সিরাজ, সৈয়দ, *মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য,* কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০০

রহমান খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর, *মুঘল ভারতের ইতিহাস,* ঢাকা: ইতিবৃত্ত প্রকাশন, ২০১৮

শাহনাওয়াজ, এ কে এম, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্য যুগ : মোগল পর্ব),* ঢাকা : মেসার্স প্রতীক প্রকাশন সংস্থা, ২০০২

সরস্বতী, সরসীকুমার, *পাল যুগের চিত্রকলা,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫

হোসেন, এ. বি. এম., *ইসলামী চিত্রকলা,* ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৪

বাংলা সাময়িকী

অশোক কুমার দাস, 'মুঘল দরবারে মহিলা শিল্পী', *চারুকলা,* রাজ্য চারুকলা পর্ষদ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা : সন ১৪১৬ (ইং ২০০৯)

নাজমা খান মজলিস, 'উত্তর ভারতে সুলতানী চিত্রকলা : একটি সমীক্ষা', *ইতিহাস,* বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৩৫ বর্ষ একক

……, 'মুঘল মিনিয়েচারে হাশিয়া' (১৫৫৬-১৬৫৮), ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২২ বর্ষ ১ম